وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূ বুরদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত,
তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন,
কাউকে যেন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অপরাধের নির্দিষ্ট হদ্দ (দণ্ড) ব্যতীত দশ বেত্রাঘাতের বেশি বেত্রাঘাত না করা হয়।
(ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩৫২)।

● ৫ম বর্ষ ● ৬ষ্ঠ সংখ্যা ● এপ্রিল ২০২১
Web : www.al-itisam.com

সূচিপত্র

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٥، شعبان و رمضان ١٤٤٢ هـ/ أبريل ٢٠٢١م العدد: ٦، الجزء: ٥٤
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

জামা মসজিদ, দিল্লি, ভারত : ভারতের অন্যতম সৌন্দর্যমণ্ডিত গগনভেদী দুটি সুউচ্চ মিনার ও তিন গম্বুজবিশিষ্ট জামা মসজিদটি (১৬৪৪-১৬৫৬খ্রি.) সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত হয়। এর নির্মাণ ব্যয় হয় ১ মিলিয়ন রুপি এবং এতে কাজ করে ৫ হাজার শ্রমিক। এর প্রাঙ্গণে এক সাথে ২৫ সহস্রাধিক মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারেন।

নিবরাস প্রকাশনী কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বইসমূহ

রিযিক্ব
লেখক : আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
পৃষ্ঠা : ৯৬ ■ মূল্য : ৭০ টাকা

কে বড় লাভবান
লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৬০ ■ মূল্য : ১৫০ টাকা

কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত
লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৮০ ■ মূল্য : ১৫০ টাকা

তাফসির কি মিথ্যা হতে পারে?
লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ১৯৬ ■ মূল্য : ১০০ টাকা

যোগাযোগ : নিবরাস প্রকাশনী
রাজশাহী শাখা : এমাদ আলী প্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী। মোবা : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬
বাংলাবাজার শাখা : গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৪০৭-০২১৮৫০

Al-itisam TV
কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার লক্ষ্যে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর অফিসিয়াল মিডিয়া আল-ইতিছাম টিভি। শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ সহ অন্যান্য আলোচকদের কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক নিয়মিত দারস পেতে আল-ইতিছাম টিভি সাবস্ক্রাইব করুন!

www.facebook.com/alitisamtv www.youtube.com/c/alitisamtv

৫ম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
এপ্রিল- ২০২১
চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৮
শা'বান-রামাযান
১৪৪২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- প্রধান সম্পাদক,
  আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
  তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
  ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
  ০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
  ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
  বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
  বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দারসে হাদীছ
  - » বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধি একজন মুমিনকে কোন পথে পরিচালিত করে? ০৩
    -মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল
- প্রবন্ধ
  - » আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব (পর্ব-৫) ০৬
    -মূল (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর
    অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান
  - » কা'বার ইতিহাস ০৯
    -মাহবূবুর রহমান মাদানী
  - » তারাবীহর রাকআত সংখ্যা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ১২
    -আহমাদুল্লাহ
  - » তাক্বদীর নিয়ে কিছু কথা ১৫
    -সাঈদুর রহমান
  - » রামাযান মাসে কতিপয় বিদআত ও সুন্নাহ বিরোধী কার্যক্রম : একটি পর্যালোচনা ১৭
    -সাজ্জাদ সালাদীন
  - » আপনার সমীপে আপনার আমানত! ২২
    -মীযান মুহাম্মদ হাসান
- হারামাইনের মিম্বার থেকে
  - » 'আমি আগামীকাল তা করব' বলার শিষ্টাচার ২৪
    -অনুবাদ : আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
- তরুণ প্রতিভা
  - » নফল ছালাত ২৭
    -মো. দেলোয়ার হোসেন
- সাময়িক প্রসঙ্গ
  - » একের পর এক আলেমের উপর হামলা : কোন দিকে যাচ্ছে পরিস্থিতি? ৩১
    -জুয়েল রানা
- দিশারী
  - » রামাযান মাস, বন্দী শয়তান, তবুও আমরা খারাপ কাজ করি কেন? ৩৪
    -জাবির হোসেন
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান
  - » দুনিয়াবী জীবন ৩৯
    -সোলায়মান সরকার
- কবিতা ৪১
- বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ৪২
- জামি'আহ সংবাদ ৪৪
- সওয়াল-জওয়াব ৪৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

মাহে রামাযান : একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার আহ্বান

মানুষ মানেই ভুল। ভুলের অনিবার্য পরিণতি পাপ। সেই পাপ যখন মানুষের মাথার বোঝা হয়ে আসে, তখন পাপের ভার নামিয়ে দিয়ে মানুষকে পবিত্র করার জন্য রামাযানের আগমন ঘটে। 'রময' অর্থ জ্বালিয়ে দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া *(লিসানুল আরাব)*। তাই রামাযান! জ্বলে-পুড়ে খাক হওয়া; ক্ষুধায় উদর জ্বলা; পাপ পুড়িয়ে ভস্ম করে সেই ছাই উড়িয়ে অমূল্য রতনের সন্ধান। রামাযান! এতেই নাযিল হয়েছে কুরআন; মানবমণ্ডলীর হেদায়াত ও কল্যাণ, ন্যায়ের বিধান *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। রামাযান! মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান আহ্বান। স্বীয় ভুল সংশোধন করে প্রতিটি মানুষ যেন সোনার মানুষে পরিণত হয় সেই লক্ষ্যে অতীতকাল থেকে চলে আসা মহা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছিয়াম মুসলিম জাতির উপর ফরয করা হয় ২য় হিজরীর শা'বান মাসে *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*।

মহান রবের কোনো বিধানই অমূলক নয়। প্রতিটি বিধানের মধ্যে রয়েছে প্রাণীকুলের সার্বিক কল্যাণ। কখনো সেই কল্যাণ আমরা উপলব্ধি করতে পারি, কখনো পারি না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে শারীরিক, আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতায় ছিয়ামের জুড়ি নেই। ড. লুটজানারের মতে, 'খাবারের উপাদান থেকে সারাবছর ধরে মানুষের শরীরে জমে থাকা কতিপয় বিষাক্ত পদার্থ (টক্সিন), চর্বি ও আবর্জনা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র সহজ ও স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে উপবাস (ছিয়াম)'। এছাড়া আরও বহু চিকিৎসাবিজ্ঞানী গবেষণার মাধ্যমে মানবজীবনে ছিয়ামের আবশ্যকতা তুলে ধরেছেন।

শুধু শারীরিক সুস্থতা নয়; বরং আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতার ক্ষেত্রেও ছিয়ামের ভূমিকা অপরিসীম। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ছিয়াম পালনকারীর দুটি খুশির মুহূর্ত রয়েছে। তার একটি হলো ইফতারের সময় *(বুখারী, হা/১৯০৪; মিশকাত, হা/১৯৫৯)*। ইফতার করার মুহূর্তে আল্লাহর হুকুম পালন করতে পারার আনন্দময় অনুভূতি যে কেমন, তা শুধু পালনকারীরাই বুঝতে পারে। ভাষায় তা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। অপরদিকে ইফতারের সময় ঘনিয়ে আসলে ছিয়াম পরিত্যাগকারী লোকদের হীনমন্যতা, মানসিক যন্ত্রণা ও অনুশোচনাবোধের সৃষ্টি হয়, তা যে কত বেদনাদায়ক তা ঐ সব লোকেরাই বুঝতে পারে।

রামাযান মাস মানেই নেকী অর্জনের প্রতযোগিতা করার মাস। মহান আল্লাহ শয়তানকে শৃঙ্খলিত রেখে মানবজাতিকে দিয়েছেন পুণ্য সন্ধানের অবারিত সুযোগ। এই মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ থাকে উন্মুক্ত। জাহান্নামের দরজাগুলো থাকে বন্ধ। এজন্যই রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'ওহে কল্যাণের সন্ধানী! অগ্রসর হও। ওহে মন্দের অন্বেষী! পিছিয়ে যাও' *(ইবনু মাজাহ, হা/১৬৪১; মিশকাত, হা/১৯৬০)*। উক্ত হাদীছের সত্যিকারের উপলব্ধির দেখা মিলে আরব দেশগুলোতে। রামাযান আসলেই ছায়েমকে ইফতার করিয়ে নেকী অর্জনের মানসে মসজিদে মসজিদে বহুপদের সামগ্রী দিয়ে চলে ইফতারের ফ্রি আয়োজন। রাস্তা-ঘাট, পার্ক-রেস্টুরেন্টে ফ্রি ইফতার সামগ্রী বিতরণের অনুপম দৃশ্য। সাথে হয়ত ইফতারের ব্যবস্থা নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন, রাস্তার পাশের ফিলিং স্টেশন থেকে হাত তুলে আপনাকে থামিয়ে ইফতারের প্যাকেট ধরিয়ে দিচ্ছে। আপনার আর প্যাকেট প্রয়োজন নেই, আপনি ভাবছেন আর ইফতার নিবো না, কিন্তু সামনে কোথাও আবার গাড়ি দাঁড় করিয়ে ইফতারের প্যাকেট ধরিয়ে দিচ্ছে। এ এক মধুর বিড়ম্বনার দেশ। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কে ইফতার দিচ্ছে, তার নামটিও অনেক সময় প্রকাশ পায় না। লৌকিকতামুক্ত আমলের এ এক অনুপম দৃষ্টান্ত। অথচ আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আয়োজনকারীর চৌদ্দ গোষ্ঠীর নাম ধরে লম্বা দু'আ না করলে হুজুরের ইমামতি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যায়।

সারা বছর ধন্য রামাযানের আগমনে। আর রামাযান ধন্য লায়লাতুল ক্বদরের অবদানে। এই রাত্রির মধ্যে রয়েছে এমন এক সুপ্ত সফলতা, যা ৮৩ বছর ৪ মাসের চেয়েও উত্তম সফলতা *(আল-ক্বদর, ৯৭/৩)*। হতভাগ্য মানুষেরা এই রাতে ঘুমিয়ে যায়। অথচ শান্তির বার্তা নিয়ে ফজর পর্যন্ত ফেরেশতাকুলকে সাথে নিয়ে জিবরীল আমীন জেগে রয় *(আল-ক্বদর, ৯৭/৪-৫)*। কেউ যদি এ রাতে জেগে থাকে, যদি কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চায়, যদি আল্লাহর ভয়ে সিজদায় পড়ে রয়; তাহলে সেই এক রাতের ইবাদতে ৮৩ বছর ৪ মাসেরও বেশি হায়াতে সমৃদ্ধ হয়ে যায়। জীবনের পবিত্র প্রবৃদ্ধি এর থেকে বেশি আর কীইবা হতে পারে? এজন্যই রামাযানের শেষ দশক আসলে ইবাদত করার জন্য রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জোরালো প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন, সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং পরিবারকেও জাগিয়ে দিতেন *(বুখারী, হা/২০২৪; মিশকাত, হা/২০৯০)*।

রামাযান মাস ক্ষমা চাওয়ার মাস, ক্ষমা পাওয়ার মাস। তবুও যারা ক্ষমা পেল না তারা কতই না হতভাগ্য! রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুৎবার মিম্বারে উঠার জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে বললেন, যে ব্যক্তি রামাযান পেল, অথচ নিজের পাপ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না, সে ধ্বংস হোক!

[সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ ২১ নং পৃষ্ঠায়]

www.al-itisam.com

বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধি একজন মুমিনকে কোন পথে পরিচালিত করে?

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِيئُهَا الرِّيحُ وَتَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا لاَ يُفِيئُهَا شَىْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

বাংলা অনুবাদ :*

কা'ব ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তির উপমা হলো, সে শস্যক্ষেতের চারাগাছের কোমল অংশের ন্যায়, বাতাসের প্রবাহ যাকে একবার নুইয়ে দেয়, বাতাসের প্রবাহ থেমে গেলে আবার সে পুনরায় সোজা হয়ে যায়। আর মুনাফিক্বের দৃষ্টান্ত হলো কঠিনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো সেই (পাইন) বৃক্ষের ন্যায়, যেটি সর্বদা দৃঢ়ভাবে সোজা হয়ে থাকে যতক্ষণ না প্রচণ্ড বাতাস তাকে সমূলে উপড়ে ফেলে'।[১]

শাব্দিক বিশ্লেষণ :

مَثَلٌ - দৃষ্টান্ত, উদাহারণ, اَلْخَامَةُ - শব্দটি মূলত خَوَامَةٌ ছিল واو কে ألف এ রূপান্তর করে خَامَةٌ করা হয়েছে। শস্যের নরম ও কোমল ডগা বা নতুন গজিয়ে উঠা কাণ্ডের নরম অংশ, اَلزَّرْعُ - শস্য, تُفِيئُهَا - তাকে নুইয়ে দেয়, উঁচু অথবা নিচু করা, কোনো বস্তুকে বাতাসের ডানে বা বামে অথবা উপরে বা নিচে নুইয়ে দেওয়া, اَلرِّيحُ - বাতাস, تَصْرَعُهَا - তাকে নিচু করে বা নুইয়ে দেয়। বাতাস গাছের ডগাকে বা মগডালকে নুইয়ে নিম্নমুখী করে দেয়, تَعْدِلُهَا - তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনে, পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে, حَتَّى - যে পর্যন্ত না, এমনকি, تَهِيجُ - শুকিয়ে যায় বা মরে যায়, اَلأَرْزَةُ - খুব পরিচিত একটি বৃক্ষ, যাকে ইংরেজিতে পাইন গাছ এবং উর্দূতে একে সানবির বলে। اَلْمُجْذِيَةُ - সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, খুব গভীরে প্রথিত, أَصْلِهَا -তার ভিত্তি বা উৎস, يَكُونُ - হয় বা হবে, اَنْجِعَافُهَا - মূলোৎপাটন বা সমূলে ধ্বংস হওয়া।

ব্যাখ্যা :

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুবই সংক্ষিপ্ত ভাষায় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে যা বুঝিয়েছেন, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি যুক্তিনির্ভর বস্তুকে বাস্তবভিত্তিক বস্তুর সাথে তুলনা করে জীবন্ত করে উপস্থাপন করেছেন। তিনি একটি অদৃশ্যমান বস্তুকে দৃশ্যমান বস্তুর সাথে তুলনা করে অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই রকম জীবন্ত ও প্রাণবন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহারের অলৌকিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং যার ভাষার স্পষ্টতা এবং বাক্যের আলংকারিক সৌন্দর্য অত্যন্ত মধুর ও দারুণ আকর্ষণীয়।

নবুঅতী ধারায় দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের বিচারে এটি সবচেয়ে তাৎপর্যবহ এবং অলংকারপূর্ণ দৃষ্টান্ত। যেখানে একজন মুমিনের অবস্থার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর বিপদের সম্মুখীন হওয়াকে একটি শস্যের সদ্য বেড়ে উঠা নরম ডগার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যাকে বাতাস আন্দোলিত করে। উদ্ভিদের ডগা সর্বদা বাতাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আন্দোলিত হয়, কখনোই এর ব্যতিক্রম হয় না। ফলে সে ভেঙেও যায় না বা ক্ষতিগ্রস্তও হয় না। আর বাতাসের প্রবাহ থেমে গেলে তা স্বস্থানে ফিরে আসে। এমনটা শুধু একজন মুমিনের জীবনেই ঘটে থাকে।

বিপদ-আপদ মানুষের স্বভাবসুলভ আচরণকে উন্মুক্ত করে দেয়, তার আত্মার অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। শুধু আল্লাহর প্রতি ঈমানই বিপদাপদ বা পরীক্ষার ব্যর্থতা থেকে একজন মুমিনকে রক্ষা করতে পারে। বিপদাপদের মাধ্যমে একজন মুমিনের হৃদয় পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কার হয়। তার ভাষা মধুর ও জিহ্বা সংযত হয়। বিপদাপদ তাকে বিনয়ী ও নম্র করে। মুমিন একবার বিপদগ্রস্ত হলে আবার পরক্ষণে তিনি বিপদ থেকে মুক্ত হন। তাঁর জীবন সর্বদা নিরাপত্তা কিংবা দূর্বিপাকের কবলে ঘুরপাক খেতে থাকে।

রোগ-শোক, বালা-মুছীবত, ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ ইত্যাদি একজন মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কঠিন ব্যর্থতা, ভয়ানক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি তাকে মোকাবিলা করতে হয় প্রতিনিয়ত। নানান সমস্যা, বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা ও সীমাহীন বাধা তাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে। অপ্রাপ্তির বেদনা, হারানোর যন্ত্রণা ও পরাজয়ের গ্লানি তাকে বিচলিত করতে পারে না। ব্যক্তিগত বিপর্যয়, পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক অত্যাচার, রাষ্ট্রীয় যুলুম ইত্যাদিতে তিনি

* প্রভাষক, বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮১০।

www.al-itisam.com

আহত হন না। কারণ, তিনি ভালো করে জনেন, এই সমস্ত প্রতিকূলতা তেমন একটা স্থায়ী হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘(হে মুমিনগণ!) যদি তোমরা ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় তারা যা কিছু করে, তার সবকিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে আছে’ *(আলে-ইমরান, ৩/১২০)*।

এই বিপদাপদের কারণে তার পরকালীন জীবন বিপদমুক্ত হয় আর তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই কারণে তিনি ধৈর্যধারণ করেন এবং ধৈর্যের পন্থা অবলম্বন করেন। আল্লামা ত্বীবী এখানে একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলছেন, এখানে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন মুমিন আত্মাকে দুনিয়ার জীবন হতে একেবারে নির্লিপ্ত রাখেন। দুনিয়ার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ-উপভোগ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। বিপদাপদে সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং এটা বিশ্বাস করেন যে, তাকে পরকালীন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কেননা পরকালীন জীবনই হচ্ছে তার স্থায়ী থাকার এবং সেখানেই অনন্তকালের জন্য বসবাসের জায়গা।[২] মোদ্দাকথা, একজন মুমিন কখনোই সমস্যামুক্ত বাধাহীন জীবনযাপন করতে পারেন না। দুনিয়ার জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তিনি ভোগ করতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রূযী প্রশস্ত এবং (যার জন্য ইচ্ছা রূযী) সংকুচিত করেন। আর তারা (কাফের/মুশরিকরা) পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিব জীবন তো পরকালের তুলনায় একেবারে নগণ্য বিষয়’ *(আর-রা’দ, ১৩/২৬)*।

রোগ-ব্যাধি মুমিনের ঈমানী পরীক্ষার কষ্টি পাথর। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা সময়ে সময়ে রোগ-ব্যাধি, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি দিয়ে মুমিনের ঈমানী পরীক্ষা চলমান রাখবেন। পরীক্ষা বলতেই আতঙ্কের বিষয় মনে করা হলেও মুমিন এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ তিনি খুব ভালো করেই জানেন, পরীক্ষার কোনো বিকল্প নেই। মৃত্যু যেমন অবধারিত সত্য, একে যেমন অস্বীকার করা যায় না। পরীক্ষা বা রোগ-ব্যাধিও তদ্রুপ মুমিন বান্দার জীবনে অবধারিত সত্য। একে প্রতিহত করার কোনো বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, ‘আমি অবশ্যই তোমাদের কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জীবনের ক্ষতি এবং ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করব’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ‘আমি তোমাদেরকে ভালো এবং মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩৫)*।

অত্যন্ত শক্ত ও দীর্ঘজীবী একটি গাছের সাথে একজন কাফের বা মুশরিককে তুলনা করা হয়েছে। এটি একটি পরিচিত গাছ। এর ইংরেজি নাম পাইন। এ জাতীয় বৃক্ষ অনেক লম্বা এবং প্রচণ্ড শক্ত হয়ে থাকে। এরা দীর্ঘ বয়স পেয়ে থাকে। এরা সহজে মরে না, তবে যখন মারা যায়, তখন সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। একজন কাফেরের জীবন ঠিক এমনটাই হয়ে থাকে। সে সম্পূর্ণটাই অপবিত্র থাকে। কোনো প্রকার বিপদাপদ তাকে স্পর্শ করে না। দুনিয়ার জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগের পথ তার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তাকে অবারিত আরাম-আয়েশ ও অফুরন্ত ভোগ-বিলাসের সুযোগ করে দেওয়া হয়, যাতে করে তার পরকালীন শাস্তি আরও কঠিন ও ব্যাপক হয়। পরকালীন জীবনে শাস্তি বৃদ্ধির ফলস্বরূপ দুনিয়ার জীবনে তার বিপদাপদ কমিয়ে তাকে পর্যাপ্ত অবকাশ লাভের সুযোগ করে দেওয়া হয়। তাদের অবস্থার বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, ‘আপনি যদি তাদেরকে দেখেন, তাদের দেহাবয়ব আপনার নিকট আকর্ষণীয় মনে হবে, আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনেন। মনে হয় যেন তারা প্রাচীরের কাঠ। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিপক্ষের মনে করে। তারাই প্রকৃত শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন’ *(আল-মুনাফিকুন, ৬৩/৪)*।

একজন মুমিন আল্লাহ তাআলার ফয়সালার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য করেন। তিনি কখনই আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যান না বা কোনো শাস্তির কারণে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন না, বরং তিনি ধৈর্যধারণ করেন এবং ছওয়াবের প্রত্যাশা করেন। আর এটাই হচ্ছে ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাসের প্রকৃত চাহিদা। কারণ তিনি ভালো করেই জানেন যে, আল্লাহ তাআলার পরীক্ষা তার পরকালীন জীবনকে উন্নত করবে। ফলে দুনিয়ার জীবনের সকল বিপদাপদ এবং বালা-মুছীবত তার নিকট তুচ্ছ ও হালকা হয়ে যায়। এছাড়া আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছেন, যারা তাঁর এমন নৈকট্য অর্জন করেন যে, যার কারণে তারা বিপদাপদকে উপভোগ্য মনে করেন এবং আরও বিপদাপদে আপতিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকেন। মুমিনগণের বিপদাপদকে আলিঙ্গন করার অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ এরশাদ করেন,

২. শারফুদ্দীন হুসাইন ইবনু আব্দুল্লাহ ত্বীবী, কাশিফ মিন হাক্বাইক্বিস সুনান।

www.al-itisam.com

‘যখন মুমিনগণ শত্রুবাহিনীকে দেখলেন, তখন বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাঁদের ঈমান ও আত্মতৃপ্তি আরো বৃদ্ধি পেয়ে গেল’ *(আল-আহযাব, ৩৩/২২)*।

সামাজিক বিপদ, ব্যবসায়িক ব্যর্থতা, আর্থিক দৈন্যতা ইত্যাদি একজন মুমিনের মনোবলকে দৃঢ় করে। চরম অর্থসংকট ও সামান্য অবৈধ প্রাপ্তি তাকে অন্যায় কাজ করতে প্রলুব্ধ করতে পারে না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মুমিনের প্রত্যেকটি কর্মই দারুণ চমৎকার। তাঁর (জীবনের) এমন কোনো ঘটনা নেই, যার মধ্যে কল্যাণ নিহিত নেই। আর এমনটি শুধু একজন মুমিনের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। যদি তার জীবনে সাফল্য আসে, তখন তিনি আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ফলে এটি তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তাঁর জীবনে ব্যর্থতা আসে, তখন তিনি ধৈর্যধারণ করেন। ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়’।[৩]

অবৈধ প্রলোভন, হারাম প্রদর্শনী, অন্যায় আবেদন ইত্যাদি তাঁকে পাপের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না। সামাজিক অনাচার, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি তাকে স্পর্শ করতে পারে না। বরং ইসলামী আদর্শের অনুসরণ, আত্মার উন্নতিসাধন, কল্যাণমূলক কাজের অনুপ্রেরণা সর্বদা তাকে ধৈর্যশীল, আত্মসংযমী ও কল্যাণমুখী করে গড়ে তোলে। লোক্বমান আলাইহিস সালাম তাঁর সন্তানকে ধৈর্যের যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তার বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, ‘হে বৎস! বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয় এটা সাহসিকতাপূর্ণ কাজ’ *(লোক্বমান, ৩১/১৭)*।

নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া ভুল, সংঘটিত পাপ ইত্যাদিকে একজন মুমিন পর্যালোচনা করেন এবং ভুলগুলো সংশোধন করে নিজেকে সত্যের পথে পরিচালিত করেন। ঈমানের আলোকে আলোকিত হয়ে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে পবিত্রতার পথে অগ্রসর হন তিনি। পরকালীন জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সেই ব্যক্তি জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, যে তার নিজের আত্মপর্যালোচনা করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য (নেক) আমল করে। আর ঐ লোক দুর্বল, যে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আর আল্লাহর নিকট অবাস্তব আশা পোষণ করে।[৪]

কোনো বিপদাপদে একজন মুমিন আতঙ্কিত হন না। তিনি বেশি বেশি ইস্তেগফার পাঠ করেন। কেননা তিনি জানেন, রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুছীবত মুমিনের জন্য রহমত। তিনি মনে করেন, প্রত্যেকটি বালা-মুছীবত কিংবা রোগ-ব্যাধি আসার পিছনে কোনো না কোনো রহস্য লুক্কায়িত থাকে, যা সাধারণ মানুষ অনুধাবন করতে পারে না। কিন্তু একজন মুমিন ঠিকই তা অনুধাবন করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা অহেতুক কোনো কাজ করেন না। অন্যায়ভাবে তিনি বান্দার উপর কোনো শাস্তি চাপিয়ে দেন না। রোগ-ব্যাধি প্রদান করে তিনি বান্দার গুনাহ মাফ করে দেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মুসলিমদের উপর যে সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন’।[৫] ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘একজন মুসলিমকে কোনো রোগ-ব্যাধি বা অন্য বিপদাপদ আক্রমণ করে না, কিন্তু আল্লাহ তার পাপসমূহ ঐভাবে মিটিয়ে দেন, যেমনভাবে (শীতকালে) গাছের পাতা ঝরে যায়’।[৬]

বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদিকে আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ কল্যাণ ও অফুরন্ত পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে পথ চলেন। এভাবেই একজন মুমিন নিজের জীবনকে করেন ধন্য। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যখন তারা বিপদে আপতিত হয়, তখন বলে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজেঊন (ইহা অবশ্যই আল্লাহর জন্যই ঘটেছে এবং আবশ্যই আমরা আল্লাহর নিকট ফিরে যাব)। তারা সেই সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এরা ওরাই, যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৬-৫৭)*।

দুনিয়াতে যত ধরনের রোগ-ব্যাধি রয়েছে, আল্লাহ তাআলাই মানুষকে প্রত্যেকটি রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

[দারসে হাদীছ-এর বাকী অংশ ৪০ নং পৃষ্ঠায়]

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৯৯।

৪. তিরমিযী, হা/২৪৫৭, তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান বললেও অন্যরা হাদীছটিকে দুর্বল বলেছেন।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৩৯।

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭১।

আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব

মূল (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর
*অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান**

(পর্ব-৫)

ভুল ধারণা-৫ : আহলেহাদীছগণ চার ইমামকে মান্য করেন না এবং তাদের পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করে থাকেন :

আহলেহাদীছদের সম্পর্কে আরো একটি ভুল ধারণা হলো, আহলেহাদীছগণ চার ইমামকে মান্য করেন না; বরং উল্টো তাদের মানহানি করেন এবং তাদের পথভ্রষ্ট আখ্যা দেন। আসুন! এই বিষয়ে আহলেহাদীছদের অবস্থান কী, তা পর্যালোচনা করি :

১. ইমামগণের ব্যাপারে আহলেহাদীছদের অবস্থান : এই বিষয়ে বর্তমান যুগের একজন বিখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন,

وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْحَقُّ الْوَسَطُ : نَأْخُذُ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ مَا وَافَقَ الدَّلِيْلَ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ، وَنَتْرُكُ مَا خَالَفَ الدَّلِيْلَ وَنَعْتَذِرُ لِلْعُلَمَاءِ فِيْ خَطَئِهِمْ وَنَعْرِفُ قَدْرَهُمْ وَلَا نَنْتَقِصُهُمْ.

‘সঠিক ও ইনছাফপূর্ণ কথা হলো- আলেম এবং ফক্বীহগণের যে সকল কথা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে মিলে যাবে, তা আমরা গ্রহণ করব। আর যে সকল কথা কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত হবে, তা আমরা বর্জন করব[১] এবং তাদের ভুলের কারণে তাদের অপারগ মনে করব ও তাদের সম্মান প্রদর্শন করব। কখনোই তাদের মর্যাদার হানি করব না’।[২]

আহলেহাদীছদের মতে চারজন ইমাম অবশ্যই সম্মানের অধিকারী, তবে তাদের কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নন। এই সম্মানিত ইমামগণের ইলমী খেদমতকে অস্বীকার করা আল্লাহ তাআলার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের নামান্তর। কেননা এই ইমামগণ উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক বিরাট অনুগ্রহ। তারাই হলেন আকাবির, যারা কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করেছেন এবং তৎকালীন সময়ে সংঘটিত সকল জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীছের দলীলভিত্তিক প্রদান করেছেন। এই সকল মহান ইমামদের গবেষণা এবং জ্ঞানের জগতে তাঁদের খেদমতের ফল শুধু তৎকালীন সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং পরবর্তী যুগের গবেষক ও ফাতওয়াবিদদের জন্য পথনির্দেশিকা এবং আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করছে। এই সকল ইমামের খেদমত অস্বীকার করা, তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করা এবং তাদের সম্মান প্রদর্শন না করা মূলত আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করারই শামিল। কেননা যে মানুষের প্রতি অকৃতজ্ঞ, সে আল্লাহর প্রতিও অকৃতজ্ঞ।

চার ইমাম সম্পর্কে আহলেহাদীছগণের বক্তব্য হলো- তাদের জ্ঞান হতে উপকৃত হওয়া যাবে। কিন্তু তাদের কোনো এক জনের আনুগত্য করে অন্যদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া যাবে না। আবার একজনের সকল কথা মানতে গিয়ে বাকি তিন জনের কোনোও ফাতওয়া মানা হবে না, এটাও করা যাবে না। আহলেহাদীছগণের মতে এই ধরনের কর্ম চরম বেইনছাফী। কেননা এমন গোঁড়ামির কারণে মানুষ অবশিষ্ট তিন ইমামের

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ‘দলীলের বিপরীত আরেকটি বিষয় হলো, নিষ্পাপ ব্যক্তি অর্থাৎ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া অন্য কারো তাক্বলীদ করা। সঠিক কথা হলো, কোনো একজন আলেম কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে গবেষণা করলেন। তখন তার অনুসারীরা মনে করে, অবশ্যই তিনি সঠিকতার উপর রয়েছেন। এই ধারণার ভিত্তিতে তারা ছহীহ হাদীছকেও প্রত্যাখ্যান করে। এমন তাক্বলীদের উপর রহমতপ্রাপ্ত উম্মাহগণ ঐকমত্য পোষণ করেননি। কেননা তারা মুজতাহিদগণের তাক্বলীদের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করতেন, কিন্তু তারা এটাও মনে করতেন যে, মুজতাহিদগণ কখনো ভুল করেন আবার কখনো সঠিক করেন। সেইসাথে মাসআলার ক্ষেত্রে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীছের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং এই সংকল্প রেখেছেন যে, যখন তার অনুসৃত তাক্বলীদের বিপরীতে কোনো ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে, সাথে সাথে তাক্বলীদ বর্জন করে হাদীছের অনুসরণ করবে’ *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১/২১২-২১৩)*।
ইবনু তায়মিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘কারো কথার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে দলীল থাকা ব্যতীত তার সকল কথার অনুসরণ করাকে আবশ্যক মনে করা সঠিক নয়। বরং এই মর্যাদা একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর। অন্য কারো জন্য তা প্রযোজ্য নয়’ *(মা‘জমুল ফাতাওয়া, ৩৫/১২১)*।

২. আল-আজবিবাতুল মুফীদা আন-আসইলাতিল মানাহিজিল জাদীদা, ২৫ নং প্রশ্ন।

অমূল্য জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। আবার এটা কেমন মূলনীতি যে, একজন ইমামের মতকে মানতে গিয়ে বাকি তিনজন ইমামের মতকে দলীল ব্যতীত বর্জন করা হবে? আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, নবী ﷺ-এর কথার বিপরীতে কোনো ইমামের কথার অনুসরণ না করায় আহলেহাদীছগণকে ইমাম বিরোধী বা ইমামের অস্বীকারকারী এমনকি ইমামের দুশমন বা অপমানকারী হিসেবেও আখ্যায়িত করতে তারা সঙ্কোচবোধ করে না। কিন্তু একজন মাযহাবী নিজ ইমামের অনুসরণ করতে গিয়ে তিন তিন জন ইমামের মতামতকে নির্দ্বিধায় বর্জন করেন, কিন্তু তাঁকে কখনোই ইমামের অস্বীকারকারী বা অপমানকারী বলা হয় না। বরং নিজ ইমামের মাযহাব পালন করতে গিয়ে যদি তিনি নবী ﷺ-এর বাণীকেও পাত্তা না দেন, তারপরও তার দ্বীন বা ইমানের কোনো সমস্যা হয় না!

আহলেহাদীছগণ ইমামদের ঐ সকল বক্তব্য নির্দ্বিধায় মেনে নেন, যে সকল বক্তব্য কুরআন-সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর যে সকল বক্তব্য কুরআন-সুন্নাহর দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক, তা বর্জন করেন। তাঁরা কোনো একজন ইমামের সকল বক্তব্য গ্রহণ করে বাকি সকল ইমামের বক্তব্যের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না, এমনটি নয়; বরং তারা প্রত্যেক ইমামের দলীলসম্মত সকল মতামত মেনে নেন। জ্ঞানের অপ্রতুলতা বা অন্য কোন কারণে কোন ভুল হলে সতর্ক করার পাশাপাশি তাঁদের মানহানি করা হতে বিরত থাকেন। এমনকি কোনো মাসআলায় তাদের বক্তব্য দলীলের বিপরীত কিংবা প্রাধান্যপ্রাপ্ত না হলেও তাদের ক্ষেত্রে উন্নত ধারণা পোষণ করত সে ক্ষেত্রে তাদের অপারগ মনে করেন। তাঁরা বলে থাকেন, হতে পারে তার নিকট এই হাদীছ পৌঁছেনি; কিংবা তিনি এর দ্বারা ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য নিয়েছেন; অথবা তিনি এটাকে মানসূখ বা রহিত ধারণা করেছেন; অথবা দলীলটির গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে তিনি দ্বিধায় ছিলেন ইত্যাদি।

২. মুজতাহিদের ইজতিহাদে ভুল-শুদ্ধ উভয়ের সম্ভাবনা থাকে : এখানে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়- দ্বীনী বিষয়ে সমাধান দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন বড় আলেমের ভুল হতে পারে কি?

এর উত্তর সরাসরি নবী করীম ﷺ-এর হাদীছের মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেছেন, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ‘যখন কোনো ফয়সালাকারী ইজতিহাদ করে কোনো বিষয়ে সমাধান দেন এবং তাঁর সমাধানটি সঠিক হয়, তাহলে তিনি দুটি ছওয়াব পান। আর যদি তাঁর ইজতিহাদ করে প্রদত্ত সমাধান ভুল হয়, তাহলে তিনি একটি ছওয়াব পান’।[৩] এখান থেকে দুটি বিষয় জানা গেল :

(ক) মুজতাহিদগণের গবেষণায় ভুল হতে পারে।

(খ) ভুল হওয়া সত্ত্বেও চেষ্টার কারণে মুজতাহিদ একটি ছওয়াব পাবেন।

নবী করীম ﷺ-এর এই বর্ণনার পর কোনো মুমিনের জন্য এ কথা বলা উচিত হবে না যে, মুজতাহিদদের ভুল হতে পারে না।

৩. আহলেহাদীছগণ মুজতাহিদদের ভুল ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করেন না : এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, কেউ যেন ভুলবশত এই ধারণা পোষণ না করে যে, যেই মাসআলার ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ভুল করেছেন, সেই মাসআলায় আমরা আমল করে ছওয়াব অর্জন করব। সুতরাং সঠিক হোক আর ভুল সর্বাবস্থায় আমরা ছওয়াব পাব। মুজতাহিদদের কোনো মাসআলায় আমাদের বিরোধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি কোনো ব্যক্তি এই ধারণাকে মূলনীতি বানিয়ে নেয়, তাহলে অবশ্যই তা ভুল হবে। কেননা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর চমৎকার ফয়ছালাই তাদের এই ভুল ধারণার দূর্গকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য যথেষ্ট।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, السُّنَّةُ مَا سَنَّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، لَا تَجْعَلُوْا خَطَأَ الرَّأْيِ سُنَّةً لِلْأُمَّةِ ‘সুন্নাহ তো সেটাই, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ সাব্যস্ত করেছেন। তোমরা কারো ইজতিহাদী (গবেষণামূলক) ভুলকে সুন্নাহ বানিয়ে দিয়ো না’।[৪] একথার স্বপক্ষে কুরআনুল কারীমের বর্ণনা রয়েছে, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ‘যে বিষয়ে তোমরা

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/৩২৪০।
৪. জামেউল বায়ান, পৃ. ২০১৪; ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন, ১/৫৭।

www.al-itisam.com

ভুল করো, সে বিষয়ে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু তোমাদের মন থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে করে থাকলে (তাতে অপরাধ আছে)। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু *(আল-আহযাব, ৩৩/৫)*।

বুঝা গেল, জেনে-বুঝে ভুল করা মুজতাহিদ বা সাধারণ মানুষ কারো জন্য বৈধ নয়। সুতরাং কারও নিকট দলীলভিত্তিক সত্য স্পষ্ট হলে তার জন্য নিজে যেমন ভুলের উপর অটল থাকা বৈধ নয়। তদ্রূপ অন্যকেও ভুলের উপর পরিচালিত করা বৈধ নয়। এমনকি স্বয়ং মুজতাহিদগণের নিজেদের ভুল হতে সঠিক পথে ফিরে আসার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং এই সকল মুজতাহিদের পদাঙ্ক অনুসারীদের ভুল হতে হক্কের পথে ফিরে আসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা একান্ত কর্তব্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ইমাম আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য তুলে ধরা হলো, وَيْحَكَ يَا يَعْقُوْبُ، لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعْ مِنِّي ، فَإِنِّيْ قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَأَرَى الرَّأْىَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ غَدًا ‘হে ইয়াকুব! তুমি আমার থেকে শোনা সকল কথা লিখো না। কেননা আজ আমি একটি মতামত পেশ করি, কাল আবার আমি তা হতে প্রত্যাবর্তন করি। আবার কাল একটি মতামত পেশ করি, পরের দিন তা বর্জন করি’।[৫]

৪. কোনো একজন ইমামের তাক্বলীদের উপর কখনোও ইজমা সাব্যস্ত হয়নি :[৬] এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, আমরা মুজতাহিদের মতামতকে এ কারণে বর্জন করি না যে, ইমামদের তাক্বলীদের উপর সমগ্র উম্মতের ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে। এই সকল ব্যক্তিদের উত্তরে এইভাবে বলা যেতে পারে যে, তাদের এই দাবি তাদের বক্তব্যের বিরোধী ও সাংঘর্ষিক।

আব্দুল হাই লাখনৌবী লিখেছেন, ‘নির্দিষ্ট মাযহাবের তাক্বলীদ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক যুগের আলেমদের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে’।[৭]

দেখুন! প্রত্যেক যুগের উলামায়ে কেরাম কোনো এক মাযহাবের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার উপর একমত ছিলেন না। তাহলে প্রশ্ন হলো, এই ইজমা কোন যুগে হয়েছিল? বাস্তব কথা হচ্ছে, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত উম্মতের কোনো ব্যক্তির সকল কথা বা বক্তব্য মানতে হবে এমন কোনো দলীল পাওয়া যায় না। মুসলিমগণ এই কথার উপর না কখনো একমত হয়েছেন, না হবেন। ইজমার দাবি নিছক দাবি মাত্র। এর পিছনের উদ্দেশ্য হলো গোঁড়ামি অথবা নিজ মাযহাব টিকানো। বরং ইজমার মাধ্যমে তো তার উল্টোটা সাব্যস্ত হয়েছে।

আশরাফ আলী থানবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘যদিও এই ব্যাপারে ইজমা পেশ করা হয়েছে যে, চার মাযহাব ব্যতীত নতুন মাযহাব বানানো জায়েয নয়। অর্থাৎ যে সকল মাসআলা চার মাযহাবের আওতাভুক্ত হবে না, তার উপর আমল করা জায়েয নয়। সঠিক ও সত্য এই চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এর পিছনে কোনো দলীল নেই। কেননা আহলে যাহের (প্রকাশ্য দলীলের উপর আমলকারীগণ) প্রত্যেক যুগে ছিল। আর একথাও সঠিক নয় যে, সকল আহলে যাহের প্রবৃত্তির অনুসারী। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যদিও ইজমা সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তথাপি তাক্বলীদে শাখছী বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাক্বলীদের উপর কখনো ইজমা সাব্যস্ত হয়নি’।[৮]

উক্ত বক্তব্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় :

(ক) কোনো কোনো বিষয়ে ইজমার দাবি রয়েছে। তবে তার কোনো দলীল নেই।

(খ) হক চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার দাবির পক্ষে কোনো দলীল নেই।

(গ) তাক্বলীদে শাখছীর উপর কখনো ইজমা হয়নি।

এ সকল বক্তব্য সামনে রেখে বলা যায়, কোনো মানুষকে নির্দিষ্ট এক ইমামের কিংবা চার ইমামের কোনো একজনের অনুসারী বানানো একটি দলীলবিহীন কাজ, যার ব্যাপারে প্রত্যেক যুগের আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

(চলবে)

---

৫. ইবনু আবিদীন ফী হাশিয়াতিহি ‘আলাল বাহরির রায়েক্ব, ৬/২৯৩।

৬. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল ছাহাবী, পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল তাবেঈ, পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল তাবে‘ তাবেঈর ঐকমত্যে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাদের পূর্ববর্তীদের বা তাদের মধ্য হতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির সকল বক্তব্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ’।

৭. আব্দুল হাই, মাজমূউল ফাতাওয়া, পৃ. ১৪৯, ১২৯ প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৮. তাযকেরাতুর রাশীদ, ১/১৩১।

কা'বার ইতিহাস

-মাহবুবুর রহমান মাদানী*

اَلْكَعْبَةُ কা'বা আরবী শব্দ ك-ع-ب ধাতুমূল থেকে উৎপত্তি, অর্থ- উঁচু হওয়া। কা'বাগৃহ সমস্ত গৃহের তুলনায় স্থানগত ও মর্যাদাগত বিবেচনায় সুউচ্চ বলেই তাকে কা'বা বলা হয়। কা'বা সঊদী আরবের মক্কা নগরীতে অবস্থিত। কা'বা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র স্থান। দুনিয়ার সর্বপ্রথম ইবাদত গৃহ। মুসলিমদের কিবলা, পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে সেদিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতে হয় *(আল-বাক্বারা, ২/১৫০)*। ছালাতের সময় বান্দার থাকে দুটি অভিমুখী সত্তা- একটি হলো আত্মা এবং অপরটি হলো দেহ। তার আত্মা অভিমুখী থাকে আল্লাহর প্রতি আর দেহ ও মুখমণ্ডল অভিমুখী হয় আল্লাহর এক বিশেষ নিদর্শন কা'বাগৃহের প্রতি। যে গৃহের সম্মান করতে ও যার প্রতি অভিমুখী হতে বান্দা আদিষ্ট। এটি সারা বিশ্বের মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতির বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম এবং সকল বিষয়ে একাত্মতা অবলম্বনের নিদর্শন। ত্বাওয়াফ করা কা'বার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।*

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, হিজায তথা মক্কা ও মদীনা অঞ্চল ১৩৪৪ হিজরী সনে সঊদী আরবের শাসনাধীন হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত অঞ্চল উছমানীয় শাসনের অধীনে ছিল।

কা'বার নামসমূহ : আল-কা'বাতুল মুশাররফা, আল-বায়তুল মুহাররম *(ইবরাহীম, ১৪/৩৭)*। আল-বায়তুল আতীক *(আল-হজ্জ, ২২/৩৩)*, আল-বায়তুল হারাম *(আল-মায়েদা, ৫/২, ৯৭)*। আল-মাসজিদুল হারাম *(আল-বাক্বারা, ২/১৪৪, ১৪৯, ১৯১; আল-মায়েদা, ৫/২; আল-আনফাল, ৮/৩৪; আত-তওবা, ৯/৭, ১৯, ২৮; আল-ইসরা, ১৭/১; আল-হজ্জ, ২২/২৫; আল-ফাতহ, ৪৮/২৫, ২৭)*।

আল-মাসজিদুল হারামের অর্থ : আল-মাসজিদুল হারামের প্রয়োগিক অর্থ চারটি। যথা- (১) মাসজিদুল হারাম ঐ মাসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহর চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। (২) আল-কা'বাতুল মুশাররাফা *(আল-বাক্বারা, ২/১৪৪, ছফওয়াতুত তাফসীর)*। (৩) মক্কা মুকাররামা *(আল-ইসরা, ১৭/১)*। (৪) আবার কোনো কোনো সময় ইহা দ্বারা মক্কার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এলাকাকেও বোঝানো হয় *(আত-তওবা, ৯/২৮)*।

মক্কার ভৌগোলিক অবস্থান : মক্কা পৃথিবীর মধ্যস্থিত। চারপাশে পাহাড় ঘেরা উপত্যকায় অবস্থিত মক্কা নগরী। পূর্ব আবূ কুবাইস পাহাড় এবং পশ্চিমে কু'আয়কা'আন পাহাড় নতুন চাঁদের মতো মক্কাকে বেষ্টন করে রেখেছে। সমুদ্রতল থেকে ২৭৭ মিটার (৯০৯ ফুট) ওপরে একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় শহরটি অবস্থিত, যা জেদ্দা শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার (৪৩ মাইল) এবং মদীনা শহর থেকে দক্ষিণ দিকে ৪৫০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। ২০১২ সালের হিসাব অনুযায়ী এখানে প্রায় ২ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করেন। বিশ্বের চতুর্থ উচ্চতম ভবন 'মক্কা রয়েল ক্লক টাওয়ার' এই শহরেই অবস্থিত। প্রতি বছর ১৫ মিলিয়ন মুসলিম মক্কা শহর ভ্রমণ করে। ফলে শহরটি সারা বিশ্বের অন্যতম প্রধান বিশ্বজনীন শহরে পরিণত হয়েছে।

কা'বাঘর নির্মাণের ইতিহাস : ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম কা'বাগৃহ নির্মাণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ 'আর স্মরণ করুন, যখন আমরা ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে (দেখিয়ে) দিয়েছিলাম (কা'বা) ঘরের স্থান (তৈরির জন্য) *(আল-হজ্জ, ২২/২৬)*। আল্লাহ অন্যত্রে বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম কা'বাঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং তারা বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আপনার অনুগত করুন, আমাদের বংশে একদল মানুষ সৃষ্টি করুন, যারা আপনার আজ্ঞাবহ হয় আর আমাদের ইবাদতের নিয়ম-ক্বানূন শিক্ষা দিন এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক! এদের নিকট এদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি এদের আপনার আয়াতগুলো পড়ে শুনাবে এবং এদের কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবে আর এদের বিশুদ্ধ করবে, নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(আল-বাক্বারা, ২/১২৭-১২৯)*। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর দু'আ কবুল করেন এবং কুরাইশ বংশের মধ্য থেকে শেষ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে প্রেরণ করেন।

কা'বাগৃহের প্রথম নির্মাতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম : কা'বাগৃহ সর্বপ্রথম কে নির্মাণ করেন এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেউ বলেন, সর্বপ্রথম ফেরেশতাগণ কা'বাগৃহ নির্মাণ করেন। কেউ বলেন, আদম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম কা'বাগৃহ নির্মাণ করেন। তবে সবচেয়ে প্রামাণ্য ও সঠিক মত হলো, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

সর্বপ্রথম কা'বাঘর নির্মাণ করেন। কারণ আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেন, 'পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মাসজিদ কোনটি? তিনি উত্তরে বলেন, মাসজিদুল হারাম। আবার প্রশ্ন করেন, এরপর কোনটি? তিনি উত্তর দেন, মাসজিদে বায়তুল মুক্বাদ্দাস। আবার জিজ্ঞেস করেন, এই দুটি মাসজিদ নির্মাণের মধ্যে কত দিনের ব্যবধান ছিল? তিনি উত্তর দেন, ৪০ বছর।[১] এ হাদীছে বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের ব্যবধান বর্ণনা করা হয়েছে ।

কেননা বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের প্রথম নির্মাণও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর হাতে কা'বাগৃহ নির্মাণের ৪০ বছর পর সম্পন্ন হয়। এরপর সুলায়মান আলাইহিস সালাম বায়তুল মুক্বাদ্দাস পুনঃনির্মাণ করেন। তাই আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কেই কা'বাগৃহের প্রথম নির্মাতা বলতে পারি।[২]

উল্লেখ্য, সর্বপ্রথম ফেরেশতাগণ অতঃপর আদম আলাইহিস সালাম কা'বাগৃহ নির্মাণ করেন মর্মে বর্ণিত সকল বর্ণনা দুর্বল।

কা'বাগৃহ সংস্কারের ইতিহাস : প্রথম সংস্কার করেন জুরহাম গোত্রের লোকেরা। এরপর আমালেকা সম্প্রদায়। তারপর কুরাইশগণ। অতঃপর কুরাইশদের দ্বিতীয়বার নির্মাণ কাজে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। তিনিই 'হাজারে আসওয়াদ' তথা কা'বাগৃহের কালো পাথর সকল গোত্রকে একসাথে নিয়ে স্থাপন করেছিলেন। তবে কুরাইশদের এ নির্মাণে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর ভিত্তির সামান্য পরিবর্তন ঘটে। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর যুগ থেকেই কা'বাঘরের উচ্চতা ছিল নয় হাত। কা'বাগৃহের চতুর্দিক দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তবে উপরে কোনো ছাদ ছিল না। ফলে কিছু চোর প্রবেশ করে এর মূল্যবান সম্পদগুলো চুরি করে নিয়ে যায়। অন্য দিকে বহু পুরাতন হওয়ায় প্রাচীরে ফাটল দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া সেই বছর মক্কা নগরীতে বন্যার কারণে কা'বামুখী জলধারা সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ওয়ালিদ ইবনু মুগীরা মাখযুমী সর্বপ্রথম ভাঙার কাজ আরম্ভ করেন, এরপর অন্যন্যরাও অংশগ্রহণ করেন।

কুরাইশদের সংস্কারের ফলে কা'বাগৃহের কিছু পরিবর্তন : কুরাইশদের সংস্কারের ফলে কা'বাগৃহের কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন- (ক) কা'বার উত্তরের একটি অংশ ছয় হাত কমিয়ে কা'বা থেকে আলাদা করা হয়, যাকে 'হাতীম' বলা হয়। এর কারণ হলো, তারা অর্থ সংকটের মধ্যে পড়েছিল। (খ) কুরাইশরা কা'বাগৃহের শুধু একটা দরজা রাখে। (গ) কুরাইশরা দরজাটি সমতল ভূমি থেকে প্রায় চার মিটার উঁচুতে নির্মাণ করে। এর কারণ হলো, যে কেউ ইচ্ছা করলেই যেন সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। বরং যাকে তারা অনুমতি দেবে, সেই কেবল প্রবেশ করতে পারবে। (ঘ) কা'বাগৃহের ভেতর ছয়টি পিলার ও তার উপর ছাদ দেওয়া হয়। বর্তমান কা'বাগৃহের উচ্চতা ১৫ মিটার। দক্ষিণ-উত্তর ১০ মিটার। পূর্ব-পশ্চিম ১২ মিটার। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর নির্মাণের সময় কা'বাগৃহের দুটি দরজা ছিল, একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি বাহির হওয়ার জন্য। তাই পরবর্তীতে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে বলেছিলেন, 'আমার ইচ্ছে হয় যে, কা'বাঘরের বর্তমান নির্মাণ ভেঙে দিয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক নির্মীত ভিত্তির অনুরূপ করে দিই। কিন্তু অল্প জ্ঞানসম্পন্ন নব মুসলিমদের ভুল বুঝাবুঝির আশঙ্কার কথা বিবেচনা করে আগের অবস্থায় বহাল রাখছি'।[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর কা'বাগৃহ সংস্কার : খলীফার যুগ শেষ হওয়ার পর যখন মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইচ্ছানুযায়ী কা'বাগৃহ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর অনুরূপ করার কাজে হাত দেন। ফলে তিনি কা'বাগৃহের মাটির সাথে লাগিয়ে পূর্ব-পশ্চিম দুটি দরজা স্থাপন করেন। তবে মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ-এর কা'বাগৃহ সংস্কার : আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লা-হু আনহু মৃত্যুর পর হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের নির্দেশে কা'বাগৃহ পুনরায় ভেঙে কুরাইশরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই নির্মাণ করেন। তার ক্ষমতার পর কোনো কোনো বাদশাহ হাদীছ অনুযায়ী কা'বাগৃহ নির্মাণের ইচ্ছা করেন এবং তৎকালীন বড় মুফতী ইমাম মালেক ইবনু আনাস রাহিমাহুল্লা-হু-এর কাছে এ বিষয়ে ফৎওয়া চান। তিনি ফৎওয়া প্রদান করেন যে, এভাবে কা'বাঘরের ভাঙা-গড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী শাসকদের জন্য এটি একটি খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এবং কা'বাগৃহ খেলনার পাত্রে পরিণত হয়ে যাবে। কাজেই বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় থাকতে দেওয়া উচিত। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব তার এ ফৎওয়া গ্রহণ করেন। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের নির্মাণই বহাল রয়েছে। তবে কা'বাগৃহের সংস্কার অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ ১৪১৭ হিজরীতে বাদশাহ ফাহাদ ইবনু আব্দুল আযীয ব্যাপক সংস্কার করেন।

কা'বার বাস্তব কাঠামো : কা'বার চারটি কোণ কম্পাসের প্রায় চার বিন্দু বরাবর মুখ করা। কা'বার দক্ষিণ কোণ হচ্ছে 'রুকন

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪২৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৫২০।

২. তাফসীর যাকারিয়া, সূরা আলে ইমরান, ৩/৯৬-এর আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৮৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৩।

www.al-itisam.com

আল-আসওয়াদ' (কালো পাথর), এটি একটি জান্নাতী পাথর, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে কথা বলার শক্তি দিবেন, তখন সে কথা বলবে। উত্তর কোণ হলো 'রুকন আল-ইরাকী' ইরাকের দিকে তাই তাকে ইরাকী কোণ বলা হয়। পশ্চিমে রয়েছে 'রুকন আশ-শামী' ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ 'রুকন আল-ইয়ামানী'।

মাসজিদে হারামের বর্তমান কাঠামো : কা'বার চারদিকে যে মাসজিদ দেখা যায়, তাকে মাসজিদে হারাম বলা হয়। উক্ত মাসজিদ ভেতরের ও বাইরের ছালাতের স্থান মিলে প্রায় ৩,৫৬,৮০০ বর্গমিটার (৮৮.২ একর) জুড়ে অবস্থিত। ধারণ ক্ষমতা : ৯,০০,০০০ লোক, হজ্জের সময় তা বেড়ে ৪০,০০,০০০ এ উন্নীত হয়। স্তম্ভ বা পিলার সংখ্যা : ৪৯৬টি। দরজা সংখ্যা : ১৯টি। মিনার সংখ্যা : ৯টি, যার উচ্চতা ৮৯ মিটার বা ২৯২ ফুট।[৪]

কা'বাগৃহের বৈশিষ্ট্যসমূহ : কা'বাগৃহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا 'নিশ্চয় মানবজাতির (ইবাদতের) জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ (কা'বা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কায়), বরকতময় ও সৃষ্টিজগতের দিশারী হিসাবে। তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, তার মধ্যে একটি মাক্বামে ইবরাহীম। আর যে কেউ তাতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ। আর মানুষের মধ্যে যার সেথায় যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার জন্য ফরয' *(আলে-ইমরান, ৩/৯৬-৯৭)*। কা'বাগৃহের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

(১) এই গৃহ বিশ্ববাসীর সর্বপ্রথম ইবাদত গৃহ।[৫] (২) এই গৃহ বরকত ও কল্যাণের প্রাণকেন্দ্র *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৮)*।[৬] (৩) এই গৃহ বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক *(আল-বাক্বারা, ২/১৪৪)*। (৪) তাতে মাক্বামে ইবরাহীম রয়েছে।[৭] (৫) যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায়, তাকে হত্যা করা বৈধ নয়।[৮]

(৬) সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য এ গৃহে হজ্জ করা ফরয করা হয়েছে, যদি এ গৃহ পর্যন্ত পৌঁছার কারো শক্তি ও সামর্থ্য থাকে।[৯]

আল-হাজারুল আসওয়াদ বা কালো পাথর : কা'বাঘর নির্মাণের সময় ইসমাঈল আলাইহিস সালাম পাথরের সন্ধানে নিকটবর্তী একটি উপত্যকায় গেলে জিবরীল আলাইহিস সালাম একটি পাথর নিয়ে অবতরণ করেন। যমীন পানিতে ডুবে গেলে পাথরটি আসমানে উঠে যেত। পাথর দেখে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, এটি কোথা থেকে আসল এবং কে একে নিয়ে আসল? তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, যিনি আমাকে তোমার দিকে ও তোমার পাথরের দিকে ন্যস্ত করেননি, তার তরফ থেকে এসেছে।[১০]

কালো পাথরটি দৈর্ঘে ২৫ ও প্রস্থে ১৭ সেন্টিমিটার, যা কা'বার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মাতাফ তথা ত্বাওয়াফের স্থান থেকে দেড় মিটার বা চারফুট উঁচুতে অবস্থিত।

(১) কালো পাথরটি জান্নাত থেকে এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ 'হাজরে আসওয়াদ যখন জান্নাত হতে অবতীর্ণ হয়, তখন এটি দুধের চেয়ে অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানদের পাপরাশি তাকে কালো করে দেয়'।[১১]

(২) ইবনু আব্বাস বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পাথর সম্পর্কে বলেছেন, وَاللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ 'আল্লাহর শপথ! কিয়ামতের দিন আল্লাহ এটিকে উঠাবেন, তখন এটির দুটি চক্ষু হবে, যার দ্বারা সে দেখবে, এটির একটি জিহ্বা হবে, যার দ্বারা সে কথা বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সহিত চুম্বন করেছে, তার জন্য সাক্ষ্য দেবে'।[১২]

(৩) কালো পাথরকে চুম্বন করা এবং রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করার কথা হাদীছে এসেছে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا 'কালো পাথর ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা গোনাহের কাফফারাস্বরূপ'।[১৩]

(৪) আবিস ইবনু রবী'আ বলেন, আমি উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে কালো পাথর চুমু দিতে দেখেছি এবং এই কথা বলতে শুনেছি, إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ 'আমি নিশ্চিতরূপে জানি, তুমি একটি পাথর। তুমি কারও উপকার বা অপকার করতে পারো না। যদি আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তোমাকে চুমা দিতে না দেখতাম তবে আমি কখনো তোমাকে চুমা দিতাম না'।[১৪] এতে বুঝা গেল যে, মানুষের কোনো ভালো-মন্দ পৌঁছানোর শক্তি পাথরের নেই। আরও জানা গেল যে, পাথরকে চুম্বন করা সুন্নাত মাত্র।

---

৪. তারিখু মাক্কা ওয়াল মাদীনা, পৃ. ১৫৫।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪২৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৫২০।
৬. ইবনু মাজাহ, হা/১৪০৬।
৭. তাফসীর সা'দী, সূরা আলে ইমরান, ৩/৯৬-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৪৯।
৯. তাফসীর ইবনু কাসীর, তাফসীর যাকারিয়া, সূরা আল-হজ্জ, ২২/২৭-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য; ফাতহুল বারী, ৬/৪০৯।
১০. ফাতহুল বারী, ৬/৪০৬।
১১. তিরমিযী, হা/৮৭৭, হাদীছ ছহীহ।
১২. তিরমিযী, হা/৯৬১, হাসান; ফাতহুল বারী, ৩/৫৬৩, 'হজ্জ' অধ্যায়।
১৩. তিরমিযী, হা/ ৬৫৯, হাদীছ ছহীহ।
১৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৮।

তারাবীহর রাকআত সংখ্যা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

-আহমাদুল্লাহ*

ভূমিকা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ 'ক্বিয়ামুল লায়লকে আবশ্যিকভাবে আঁকড়ে ধরো। কেননা তোমাদের পূর্বের সৎ বান্দাদের এটাই ত্বরীক্বা ছিল। আর এটা আল্লাহর নৈকট্য, গুনাহের কাফফারা ও গুনাহসমূহ থেকে হেফাযতে থাকার উপায়'।[১] এই ছালাতই যখন রামাযান মাসে আদায় করা হয়, তখন ক্বিয়ামে রামাযান ও সাধারণ লোকদের নিকটে তারাবীহ বলা হয়।

এত গুরুত্বপূর্ণ ছালাতটির রাকআত সংখ্যা কত? তারাবীহর ছালাত ৮ রাকআত। এ ব্যাপারে ছাহাবীদের মধ্যে কোনো বিভেদ ছিল না। তার কয়েকটি দলীল নিম্নরূপ :

দলীল-১ : উম্মুল মুমিনীন সাইয়েদা আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত আছে, كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ 'রাসূল ﷺ 'আতামাহ' বা এশার ছালাত হতে অবসর হওয়ার পর ফজর পর্যন্ত ১১ রাকআত পড়তেন। তিনি প্রত্যেক দুই রাকআতে সালাম ফেরাতেন এবং ১ রাকআত বিতর পড়তেন'।[২]

দলীল-২ : আবূ সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান উম্মুল মুমিনীন সাইয়েদা আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল ﷺ-এর রামাযানের মধ্যে (রাতের) ছালাত (তারাবীহ) কেমন হত? তখন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বললেন, مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً 'রামাযান হোক বা রামাযানের বাইরে হোক রাসূল ﷺ ১১ রাকআতের অধিক পড়তেন না'।[৩]

প্রশ্ন : এই হাদীছটির সাথে তাহাজ্জুদের কী সম্পর্ক? **জবাব :** তাহাজ্জুদ, তারাবীহ, ক্বিয়ামুল লায়ল, ক্বিয়ামে রামাযান একই ছালাতের ভিন্ন ভিন্ন নাম। কেননা নবী করীম ﷺ হতে তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ আলাদা আলাদা আদায় করা একেবারেই প্রমাণিত নেই। মুহাদ্দিছ ইমামগণ ও অন্য আলেমগণ আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর হাদীছের উপর 'ক্বিয়ামে রামাযান' ও 'তারাবীহ'-এর অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন। যেমন- (১) ছহীহ বুখারী, কিতাবুছ ছওম (ছওম পর্ব), কিতাবু ছালাতিত তারাবীহ (তারাবীহর অনুচ্ছেদ), ক্বিয়ামে রামাযানের ফযীলত পরিচ্ছেদ। (২) মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান আশ-শায়বানী (পৃ. ১৪১, 'ক্বিয়ামে রামাযান ও এর ফযীলত' অনুচ্ছেদ)। আব্দুল হাই লাখনভী (রাহিমাহুল্লাহ) এর উপর টীকা লিখেছেন, قوله: شهر رمضان، ويسمّى التراويح 'ক্বিয়ামে রামাযানকে তারাবীহ নামে নামকরণ করা হয়েছে'। (৩) বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরায় (২/৪৯৫, ৪৯৬) আছে, بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ 'রামাযান মাসের ক্বিয়ামে রাকআত সংখ্যা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে' অনুচ্ছেদ।

পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে কোনো একজন মুহাদ্দিছ বা ফক্বীহ এটা বলেননি যে, এই হাদীছের সম্পর্ক তারাবীহর ছালাতের সাথে নেই। এই হাদীছটিকে অসংখ্য আলেম ২০ রাকআত সম্বলিত বানোয়াট ও মুনকার হাদীছের মোকাবেলায় বিপক্ষীয় দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। যেমন- (১) আল্লামা যায়লাঈ হানাফী,[৪] (২) হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী,[৫] (৩) আল্লামা ইবনু হুমাম হানাফী,[৬] (৪) আল্লামা আইনী হানাফী,[৭] (৫) আল্লামা সুয়ূত্বী[৮] (রাহিমাহুমুল্লাহ)।

প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন স্রেফ ক্বিয়ামে রামাযান সম্পর্কিত ছিল, যাকে তারাবীহ বলে। তাহাজ্জুদ ছালাত সম্পর্কে প্রশ্নকর্তা প্রশ্নই করেননি। কিন্তু উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) জবাবের মধ্যে প্রশ্নের চাইতে অধিক ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেন নবী করীম ﷺ-এর রামাযানের ক্বিয়াম ও রামাযান ব্যতীত ক্বিয়াম সম্পর্কে। সুতরাং এই হাদীছ থেকে ১১ রাকআত তারাবীহর প্রমাণ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. কিতাবু ফাযলি ক্বিয়ামিল লায়ল ওয়াত-তাহাজ্জুদ, হা/৪, সনদ হাসান; সুনানে তিরমিযী, হা/৩৫৪৯।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৩৪।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৩; উমদাতুল ক্বারী, ১১/১২৮।

৪. যায়লাঈ হানাফী, নাছবুর রায়, ২/১৫৩।

৫. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, আদ-দিরায়াহ, ১/২০৩।

৬. ইবনু হুমাম হানাফী, ফাতহুল ক্বাদীর (প্রকাশনায় : দারুল ফিকর), ১/৪৬৭।

৭. আল্লামা আইনী হানাফী, উমদাতুল ক্বারী, ১১/১২৮।

৮. আল্লামা সুয়ূত্বী, আল-হাবী লিল ফাতাওয়া, ১/৩৪৮।

দলীল-৩ : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে, আমাদেরকে নিয়ে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসে ৮ রাকআত ও ১ রাকআত বিতর পড়িয়েছেন।[৯]

দলীল-৪ : উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে, আমি রামাযানের মধ্যে ৮ রাকআত ও বিতর পড়েছি। আর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, তো তিনি কিছুই বললেন না। فكانت سنة الرضا 'অতএব এটা সন্তুষ্টিমূলক সুন্নাত হয়ে গেল'।[১০] আল্লামা হায়ছামী এই হাদীছ সম্পর্কে বলেছেন, 'এর সনদটি হাসান'।[১১]

দলীল-৫ : আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু উবাই ইবনু কা'ব এবং তামীম আদ-দারী রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-কে হুকুম দিয়েছিলেন যে, লোকদেরকে (রামাযানে রাতের সময়) ১১ রাকআত পড়াবে।[১২]

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত : রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ 'তোমাদের মধ্য হতে যে এই ইখতিলাফ পাবে, তার উপর আবশ্যক যে, সে আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরবে'।[১৩]

দলীল-১ : আস-সায়েব ইবনু ইয়াযীদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে, كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً 'আমরা (ছাহাবীগণ) উমার ইবনু খাত্ত্বাবের যুগে ১১ রাকআত পড়তাম'।[১৪]

জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (মৃ. ৯১১ হি.) এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে লিখেছেন, وَفِي مُصَنَّفِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ بِسَنَدٍ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ 'এটা (১১ রাকআতের বর্ণনাটি) মুছান্নাফ সাঈদ ইবনু মানছূরের মধ্যে অত্যন্ত ছহীহ সনদের সাথে রয়েছে'।[১৫]

দলীল-২ : أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيٍّ وَتَمِيمٍ فَكَانَا يُصَلِّيَانِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً 'নিশ্চয়ই উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু লোকদেরকে উবাই (ইবনু কা'ব ও তামীম আদ-দারী রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর ইমামতিতে একত্র করেছেন। তারা উভয়ই ১১ রাকআত পড়াতেন'।[১৬]

এই বর্ণনাটির সনদ ছহীহ। এর সকল রাবী ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের রাবী এবং ইজমা অনুপাতে আস্থাভাজন।

২০ রাকআত তারাবীহর হাদীছগুলো এক নযরে : নিচে কয়েকটি হাদীছ পর্যালোচনাসহ তুলে ধরা হলো-

দলীল-১ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসে ২০ রাকআত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন।[১৭]

জবাব : এই রেওয়ায়াত সম্পর্কে আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ وَعَلَى ضَعْفِهِ اِتِّفَاقٌ 'এটি যঈফ সনদে বর্ণিত হয়েছে। আর এর যঈফ হওয়ার উপর ঐকমত্য আছে'।[১৮]

দলীল-২ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَرَجَ النبي ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى النَّاسُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ رَكْعَةً وَأَوْتَرَ بِثَلاثَةٍ 'জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রামাযানে কোনো একদিন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। তিনি লোকদেরকে ২০ রাকআত এবং ৩ রাকআত বিতর পড়ালেন'।[১৯]

জবাব : এটি জাল হাদীছ। এর একজন রাবী মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়েদ সম্পর্কে দেওবন্দী আলেম খান বাদশাহ লিখেছেন, 'ইনি হলেন মহা মিথ্যুক ও মুনকারুল হাদীছ'।[২০] এর অপর রাবী উমার ইবনু হারূনও সমালোচিত।[২১] অবশিষ্ট সনদেও আপত্তি আছে।

দলীল-৩ : আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল ক্বারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রামাযানের এক রাতে উমার ইবনুল খাত্ত্বাবের সাথে একটি মসজিদের পানে বের হলাম। লোকেরা এলোমেলোভাবে (বিভিন্ন) জামাআতে বিভক্ত। কেউ একাকী ছালাত আদায় করছে। আবার কোনো ব্যক্তি ছালাত আদায় করছে এবং (তার ইক্তিদা

৯. ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/১০৭০।
১০. মুসনাদু আবী ইয়া'লা, হা/১৮০১।
১১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/৭৪।
১২. মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, হা/২৪৯।
১৩. তিরমিযী, হা/২৬৭৬।
১৪. হাশিয়া আছারুস সুনান, পৃ. ২৫০।
১৫. সুয়ূত্বী, আল-মাছাবীহ ফী ছালাতিত তারাবীহ, পৃ. ১৫; আল-হাবী লিল ফাতাওয়া, ১/৩৫০।
১৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৭৬৭০।
১৭. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৭৬৯২।
১৮. আল-আরফুশ শাযী, ১/১৬৬।
১৯. তারীখে ইবনু জুরজান, হা/৫৫৬।
২০. আল-ক্বওলুল মুবীন ফী ইছবাতিত তারাবীহ আল-ইশরীন ওয়ার রাদ্দু আলাল আলবানী আল-মিসকীন, পৃ. ৩৩৪।
২১. নাসবুর রায়াহ, ১/৩৫১, ৩৫৫, ৪/২৭৩।

করে) একদল লোক ছালাত আদায় করছে। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে একত্রিত করে দেই, তবে তা উত্তম হবে। অতঃপর তিনি দৃঢ় (প্রতিজ্ঞ) হলেন। এরপর তিনি উবাই ইবনু কা'ব এর উপরে সকলকে জমা করে দিলেন। অতঃপর অন্য আরেকটি রাতে আমি তার সাথে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ক্বারীর (ইমামের) সাথে ছালাত আদায় করছিল। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, কতই না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা। লোকেরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাকে তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম, যে অংশে তারা ক্বিয়াম করে। (এর দ্বারা) তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন। আর লোকেরা রাতের প্রথমভাগে ছালাত আদায় করত।

জবাব : এই হাদীছটি ছহীহ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর দ্বারা হানাফীদের ২০ রাকআতের দলীল প্রমাণিত হয় না। উল্লেখ্য, এ হাদীছ থেকে পাঁচটি মাসআলা প্রমাণিত হয়। যথা- (ক) তারাবীহর জামাআত জায়েয ও উত্তম। (খ) এতে রাকআতের সংখ্যা উল্লেখ নেই। (গ) তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ একই ছালাত।[২২] (ঘ) এই বিদআত দ্বারা আভিধানিক বিদআত উদ্দেশ্য, পারিভাষিক নয়। (ঙ) এই হাদীছটি ছহীহ বুখারীর 'কিতাবু ছলাতিত তারাবীহ'-এর মধ্যে রয়েছে।[২৩]

দলীল-৪ : উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাকে আদেশ করেছিলেন, রামাযানের রাতে ছালাত পড়াতে। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই লোকেরা দিনে ছওম রাখে। কিন্তু তারা উত্তমভাবে ক্বিরাআত পারে না। তুমি যদি রাতে তাদের সামনে কুরআন পড়তে। তিনি (উবাই ইবনু কা'ব) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এ বিষয়টি তো পূর্বে ছিল না। তিনি বললেন, আমি জানি। কিন্তু এটি উত্তম। এরপর তিনি তাদেরকে নিয়ে ২০ রাকআত পড়লেন।

জবাব : এই রেওয়ায়াতটির সনদ মাক্বদেসীর 'আল-মুখতারাহ' গ্রন্থে পাওয়া যায়।[২৪] এটা যঈফ। হাফেয ইবনু হিব্বান বলেছেন, 'আবূ জা'ফর আর-রাযীর রবী ইবনু আনাস থেকে রেওয়ায়াত করায় অসংখ্য ইযত্বিরাব সংঘটিত হয়েছে'।[২৫]

দলীল-৫ : عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً 'হাসান হতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর উপর লোকেদেরকে রামাযানের ক্বিয়ামে একত্র করেছিলেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে ২০ রাকআত পড়েছিলেন।

জবাব : এই রেওয়ায়াতটি মুনক্বাত্বি' হওয়ার কারণে যঈফ। হানাফী ইমাম আইনী বলেছেন, 'এই রেওয়ায়াতের মধ্যে ইনক্বিত্বা আছে। কেননা হাসান (বাছরী) উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)কে পাননি'।[২৬]

দলীল-৬ : عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً 'ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) একজন ব্যক্তিকে হুকুম দিয়েছিলেন যে, সে যেন লোকদেরকে ২০ রাকআত পড়ায়।

জবাব : এই হাদীছ সম্পর্কে নিমাবী (হানাফী) লিখেছেন, 'ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আনছারী উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)কে পাননি'।[২৭] ইমাম ইবনু হাযম বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সাইয়্যেদুনা উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর মৃত্যুর ২৫ বছর পর জন্মগ্রহণ করেছেন।[২৮]

দলীল-৭ : عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ আব্দুল আযীয ইবনু রুফাঈ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) মদীনাতে রামাযানে লোকদেরকে নিয়ে ২০ রাকআত এবং ৩ রাকআত বিতর পড়তেন।[২৯]

জবাব : এই রেওয়ায়াত সম্পর্কে নিমাবী সাহেব লিখেছেন, আব্দুল আযীয ইবনু রুফাঈ উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)কে পাননি।[৩০] অর্থাৎ এই রেওয়ায়াতটি মুনক্বাত্বি'। আর মুনক্বাত্বি' বর্ণনা আলেমদের ঐকমত্যানুসারে যঈফ।[৩১]

দলীল-৮ : عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ، بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً 'ইয়াযীদ ইবনু রূমান হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রামাযানে উমারের যামানায় লোকেরা ২৩ রাকআত পড়তেন।

জবাব : এই রেওয়ায়াতটিও মুনক্বাত্বি'।[৩২]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

২২. বিস্তারিত দেখুন : ফায়যুল বারী, ২/৪২০।
২৩. ছহীহ বুখারী, হা/২০১০।
২৪. আল-মুখতারাহ, হা/১১৬১।
২৫. আছ-ছিক্বাত, ৪/২২৮; আনওয়ারুছ ছাহীফা ফিল আহাদীছিয যঈফা, আবূ দাঊদ, হা/১১৮২।
২৬. শরহে সুনান আবূ দাঊদ, ৫/৩৪৩।
২৭. আছারুস সুনান, হা/৭৮০-এর টীকা দ্রষ্টব্য।
২৮. আল-মুহাল্লা, ১০/৬০, মাসআলা-১৮৯৯।
২৯. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৭৬৮৪।
৩০. আছারুস সুনান, হা/৭৮১-এর টীকা দ্রষ্টব্য।
৩১. তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ, পৃ. ৭৮।
৩২. উমদাতুল কারী, ১১/১২৭, হা/২০১০-এর অধীনে।

তাক্বদীর নিয়ে কিছু কথা

-সাঈদুর রহমান*

‘ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন’ বাক্যটি প্রায় সবার মুখ থেকেই শুনা যায়; আলেম হোক বা জাহেল। তাক্বদীর বা ভাগ্য শরীআতের অদৃশ্য স্পর্শকাতর বিষয়াবলির মাঝে অন্যতম। তাক্বদীর সম্পর্কে সঠিক বুঝ ও ধারণা না থাকার কারণে অনেক মুসলিম নামধারী মানুষও পথভ্রষ্ট হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে ইসলামে বিভিন্ন দল ও উপদলের। অনেক লোক তাক্বদীর অস্বীকারকারীদের রসব্যঞ্জক আলোচনায় প্রতারিত হয়ে বিপথগামী হয়েছে। তাদের কথা ও যুক্তি খুবই চমৎকার ও শ্রুতিমধুর; যার ফলশ্রুতিতেই মানুষ দিনে দিনে তাদের পিছনে ছুটছে। তাক্বদীর নামক পথটি খুবই সংকীর্ণ, পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত। অনেকেই এ পথে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে। হ্যাঁ, তাক্বদীর খুবই পিচ্ছিল একটি পথ! পিচ্ছিল বলে হাঁটা যাবে না বিষয়টা এমন নয়; বরং খুব সতর্কতার সাথে হাঁটতে হবে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের তাক্বদীর সম্পর্কে জানার কৌতূহল জাগাটা স্বাভাবিক। কারণ জানলেই তো ঐ পিচ্ছিল পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব। পাঠকদের জ্ঞান পিপাসা নিবারণের লক্ষ্যে ও মুসলিম জাতিকে সঠিক দিশা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের অপ্রতুল জ্ঞান দিয়েই কিছু লিখার কথা অনুভব করছি। তাই কাল বিলম্ব না করে শুরু করা যাক তাক্বদীরের যাত্রা।

তাক্বদীর পরিচিতি :

অতি সংক্ষেপে যদি তাক্বদীর পরিচিতি তুলে ধরা হয়, তাহলে এভাবে বলা উচিত, ‘ভাগ্যের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ও সন্তুষ্ট থাকা’। অর্থাৎ পৃথিবীতে জীবনযাপন করার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে যে সমস্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, বিপদাপদ আমাদের উপর আপতিত হয়, তার উপর সন্তুষ্ট থাকা ও হায়-হুতাশ না করা। ধৈর্যধারণ করা এবং এই বিপদ থেকে পুণ্যের আশা করা।

তাক্বদীরের প্রকারভেদ :

তাক্বদীরের প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে অনেক মানুষ বিপদগামী হয়েছে। তাই নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো- তাক্বদীর দুই প্রকার। (১) মুবরাম (স্থায়ী) (২) মুআল্লাক্ব (ঝুলন্ত)। মুবরাম এমন তাক্বদীর যা কখনো পরিবর্তন হয় না; বান্দার জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অনিবার্যভাবে ঘটবেই। যেমন- আপনি কোনো স্থানে মৃত্যুবরণ করবেন এটা পূর্ব থেকে নির্ধারিত। একটি হাদীছে নবী করীম ﷺ বলেন, إِذَا قَضَى اللهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً ‘আল্লাহ তাআলা যখন যে জায়গায় কারো মৃত্যু হওয়ার ফয়সালা করেন, তখন ঐ জায়গায় গমনের উদ্দেশ্যে তার কোনো প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন’।[১] মুবরাম তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে ও পুণ্যের আশা করতে হবে। অহেতুক ও অযাচিত কথা বলা উচিত যাবে না। মুআল্লাক্ব হলো এমন তাক্বদীর, যা পরিবর্তন হয়। যেমন- আল্লাহ তাআলা কারো ভাগ্য নির্ধারণ করেন এভাবে, যদি আমার উমুক বান্দা উমুক স্থানে যায়, তাহলে গাড়ি এক্সিডেন্টে সে মৃত্যুবরণ করবে। হ্যাঁ, তবে সে যদি যাওয়ার আগে কোনো কিছু দান করে বা আমার কাছে হঠাৎ মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ চায়, তাহলে সে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবে। এ ধরনের তাক্বদীর সাধারণত শর্তযুক্ত থাকে। পবিত্র কুরআনে তাক্বদীরে মুআল্লাক্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট বাণী রয়েছে, وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ‘কারো বয়স বৃদ্ধি বা হ্রাসকরণ সবই কিতাবে রয়েছে; আর এটা আল্লাহর কাছে অতি সহজ বিষয়’ (*আল-ফাত্বির, ৩৫/১১*)। এখানে দেখুন, কারো হায়াত যদি চূড়ান্তভাবে ৬০ বছর লেখা থাকে, তাহলে আবার তা বৃদ্ধি হবে কীভাবে? অথচ আল্লাহ বলছেন বয়স বৃদ্ধি পায়। বুঝা যাচ্ছে, এটা তাক্বদীরে মুবরাম নয়; বরং মুআল্লাক্ব। এ ব্যাপারটি আরো একটু সুস্পষ্ট হয় যামাখশারীর বক্তব্য দ্বারা। তিনি তাফসীরে কাশশাফে উল্লেখ করেছেন,

أَنَّهُ لاَ يَطُوْلُ عُمُرُ الْإِنْسَانِ وَلاَ يَقْصُرُ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ وَصُوْرَتُهُ أَنْ يُكْتَبَ فِي اللَّوْحِ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فُلاَنٌ أَوْ يَغْزُ فَعُمْرُهُ أَرْبَعُوْنَ سَنَةً ، وَإِنْ حَجَّ وَغَزَا فَعُمْرُهُ سِتُّوْنَ سَنَةً ، فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَبَلَغَ السِّتِّيْنَ ، وَإِذَا أَفْرَدَ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ الْأَرْبَعِيْنَ فَقَدْ نُقِصَ مِنْ عُمُرِهِ الَّذِيْ هُوَ الْغَايَةُ وَهُوَ السِّتُّوْنَ وَذَكَرَ نَحْوَهُ فِيْ مَعَالِمِ التَّنْزِيْلِ

‘মানুষের বয়স বৃদ্ধি পাওয়া বা হ্রাস ঘটার উদাহরণটা হলো এমন, আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফূযে কারো ভাগ্য এভাবে লিখে রেখেছেন, যদি উমুক হজ্জব্রত পালন না করে ও যুদ্ধে না যায়, তাহলে তার বয়স হবে ৪০। আর যদি হজ্জব্রত পালন করে ও যুদ্ধে যায়, তাহলে তার বয়স হবে ৬০। এখানে ব্যক্তি দুটি শর্ত পূর্ণ করার কারণে তার বয়স হয়েছে ৬০। কিন্তু ব্যক্তি যদি একটি শর্ত পূরণ করে, তাহলে সে চূড়ান্ত বয়সে ৬০ বছর) পৌঁছতে পারবে না, বরং তার বয়স হবে ৪০; মাআলিমুত

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. তিরমিযী, হা/২১৪৬; মিশকাত, হা/১১০।

তানযীল গ্রন্থেও এ ধরনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২] অনেক মানুষ তাক্বদীরে মুআল্লাক্ব না জানার কারণে অহেতুক আল্লাহকে দোষারোপ করে থাকে, রোগ হলে অনেকে ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকে এবং বলে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। আরো বলে, আল্লাহ ভাগ্যে যা রেখেছেন, তাই হবে। এ কথা বলে সে আর চেষ্টাই করে না। রোগ হলে সাধ্যানুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে, এটাই আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন। তিনি বলেননি যে, ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকো। একটি হাদীছে আছে, ছাহাবায়ে কেরাম নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের রোগ হলে কি আমরা তাক্বদীরের উপর নির্ভর করে বসে থাকব, নাকি প্রতিষেধক গ্রহণ করব? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, 'প্রতিষেধক গ্রহণ করো; এটাও তাক্বদীরে রয়েছে'।[৩] আমরা তো জানি না আমাদের তাক্বদীরে কী লেখা আছে, তাই তাক্বদীরের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না; বরং আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করার পরও যদি সফলতা অর্জন করা সম্ভব না হয়, ঐ সময় মনে করতে হবে তাক্বদীরে আমার সফলতা নেই, তাই আমি সফল হতে পারিনি। তাই চেষ্টা না করে তাক্বদীরের উপর নির্ভর করে বসে থাকা অনুচিত।

তাক্বদীর কি পরিবর্তন হয়?

আমরা ইতোপূর্বেও বলেছি যে, তাক্বদীরে মুআল্লাক্ব পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ এই তাক্বদীর পরিবর্তন হয়। আমরা যেহেতু জানি না, আমাদের ভাগ্যে কী লেখা আছে, সেহেতু আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। কিছু ভালো কাজ করলে মানুষের তাক্বদীরে মুআল্লাক্ব পরিবর্তন হয়, তবে তাক্বদীরে মুবরাম কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন হয় না। যেমন- নবী ﷺ একটি হাদীছে বলেন, لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ। 'দু'আ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে না এবং সৎকাজ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই হায়াত বাড়াতে পারে না'।[৪] আরো একটি হাদীছে নবী ﷺ বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 'যে ব্যক্তি তার জীবিকার প্রশস্ততা কিংবা দীর্ঘায়ু পছন্দ করে, সে যেন তার আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে'।[৫] এই দুটি হাদীছ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, দু'আ, পুণ্যের কাজ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার দ্বারা মানুষের তাক্বদীর পরিবর্তন হয়। এ জন্য আমাদের পুণ্যের কাজ করতে হবে। পুণ্যের কাজ করার পরও যদি কোনো বিপদ চলে আসে, তাহলে মনে করতে হবে এটা তাক্বদীরে মুবরাম অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী তাক্বদীর। তাই এ তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে ও সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

তাক্বদীর নিয়ে অতিরিক্ত ঘাঁটাঘাঁটি করা নিষেধ :

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের শুরুতেই মুত্তাক্বীদের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। আর সেটা হলো- না দেখে আল্লাহকে বিশ্বাস করা। কেউ যদি আল্লাহর প্রস্তুতকৃত ছায়াময় কষ্ট-ক্লেশমুক্ত জান্নাতের অধিবাসী হতে চায়, তাহলে আল্লাহকে না দেখে তাকে বিশ্বাস করতে হবে। এখন কেউ যদি জান্নাতে যেতে না চায়, তাহলে সে বিশ্বাস করবে না! তাক্বদীরের পুষ্পটি যেহেতু কাঁটাযুক্ত, সেহেতু এই পুষ্প স্পর্শ করবে না এবং পুষ্প আছে শুধু এ কথা বিশ্বাস করবে! শুধু শুধু অযথা ঘাঁটাঘাঁটি করা নিষ্ফল; বরং কখনো কখনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এজন্যই নবী ﷺ ছাহাবীদের তাক্বদীর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে নিষেধ করেন। যেমন- একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ " أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَتَنَازَعُوا فِيهِ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো এক সময় আমাদের সামনে এসে দেখলেন যে, আমরা তাক্বদীর বিষয়ক তর্কে-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছি। তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন, এতে তাঁর মুখমণ্ডল এমন লাল বর্ণ ধারণ করল যেন তাঁর দুই গালে ডালিম নিংড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি বললেন, 'তোমরা কি এজন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছ, না আমি তোমাদের প্রতি এটা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি? এ বিষয়ে তোমাদের পূর্ববর্তী জনগণেরা যখনই বাক-বিতণ্ডা করেছে, তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে তোমাদেরকে বলছি, তোমরা এ বিষয়ে কখনো যেন বিতর্কে লিপ্ত না হও'।[৬] শয়তান কখনো কখনো তাক্বদীরের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্তির মাঝে ফেলে, মনের মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। যার ফলশ্রুতিতে চলে আসে মনের অজান্তেই উদ্ভট প্রশ্ন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

২. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/৬৪৩।
৩. তিরমিযী, হা/২১৪৮।
৪. তিরমিযী, হা/২১৩৯; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৫৪; মিশকাত, হা/২২৩৩।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪১৭; আবূ দাউদ, হা/১৬৯৩।
৬. তিরমিযী, হা/২১৩৩; মিশকাত, হা/৯৮।

www.al-itisam.com

রামাযান মাসে কতিপয় বিদআত ও সুন্নাহ বিরোধী কার্যক্রম : একটি পর্যালোচনা

-সাজ্জাদ সালাদীন*

ছিয়ামের সংজ্ঞা : ছওম বা ছিয়াম ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল ভিত্তির তৃতীয়। رَمَضَانُ শব্দটি رَمَضَ শব্দ হতে নির্গত। এর অর্থ পুড়িয়ে ফেলা। ছিয়াম রাখলে গুনাহ মাফ হয়। রামাযান গুনাহকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। তাই এর নাম রামাযান। ছিয়াম শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে, বিরত থাকা। তাইতো চুপ বা নিস্তব্ধ থাকাকে ছিয়াম বলে। আর যে ব্যক্তি চুপ থাকে, তাকে ছায়েম বলে।

اَلصِّيَامُ-এর আভিধানিক অর্থ হলো, সাধারণভাবে বিরত থাকা। অর্থাৎ সহবাস, কটু কথা, খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকা। صَوْمٌ অথবা صِيَامٌ শব্দদ্বয় يَصُوْمُ-صَامَ মাছদার হতে উৎপন্ন। আল্লামা রাগেব ইসপাহানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, صَوْمٌ শব্দের অর্থ হলো, কোনো কাজ হতে বিরত থাকা। এজন্য যে ঘোড়া চলা হতে বিরত থাকে, তাকে 'ছায়েম' বলা হয়। কোনো কোনো আলেম এর প্রমাণে আল্লাহ তাআলার এই আয়াত উপস্থাপন করেন, إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا 'আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছিয়ামের মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলব না' *(মারইয়াম, ১৯/২৬)*।

আলোচ্য আয়াতে صَوْمٌ শব্দটি কথা-বার্তা হতে বিরত থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ صَوْمٌ এর শারঈ ও পারিভাষিক অর্থ এভাবে করেছেন, إِمْسَاكٌ مَخْصُوْصٌ فِيْ زَمَنٍ مَخْصُوْصٍ مِنْ شَيْءٍ مَخْصُوْصٍ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ 'নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট শর্তাবলির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কতিপয় বস্তু হতে বিরত থাকার নাম ছিয়াম'।[১]

শরীআতের পরিভাষায় ছিয়াম হলো, ফজর তথা সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সঙ্গমসহ যাবতীয় ছিয়াম নষ্টকারী কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা। কারণ প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই ছিয়াম নয়, বরং অসারতা ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার নামই হলো (প্রকৃত) ছিয়াম। সুতরাং যদি তোমাকে কেউ গালাগালি করে অথবা তোমার প্রতি মূর্খতা দেখায়, তাহলে তুমি (তার প্রতিকার বা প্রতিশোধ না নিয়ে) তাকে বলো যে, আমি ছিয়াম রেখেছি, আমি ছিয়াম রেখেছি।[২]

ছিয়ামের ঐতিহাসিক পটভূমি : যুগে যুগে তাক্বওয়া অর্জনের সুযোগ ও চেষ্টা বিদ্যমান ছিল। তাই আমরা দেখি, অন্যান্য আসমানী কিতাবের অনুসারীদের উপরও ছিয়াম ফরয ছিল। একথাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 'যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছিল' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*।

হিজরী দ্বিতীয় সনে ছিয়াম ফরয হয় : প্রথমে কোন ছিয়াম ফরয ছিল এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ১০ মুহাররম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম ফরয ছিল, আবার কারও কারও মতে, 'আইয়ামুল বীয' অর্থাৎ প্রত্যেক চন্দ্রমাসে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে ছিয়াম ফরয ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন আইয়ামুল বীযের ছিয়াম রাখতেন। হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীতে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য ছিয়াম ফরয করা হয়। এ মাসেই নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত, সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং হক্ব ও বাতিলের পার্থক্যকারী। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে ছিয়াম পালন করে। তবে কেউ রোগাক্রান্ত হলে অথবা সফরে থাকলে এ সংখ্যা অন্য সময় পূরণ করবে। আল্লাহ চান তোমাদের জন্য যা সহজ তা, আর তিনি চান না তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তা, যেন তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করো এবং আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো, তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার জন্য এবং যেন তোমরা শোকর করতে পারো' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*।

উক্ত আয়াতটি নাযিলের পর আশূরার ছিয়াম অথবা আইয়ামুল বীযের ছিয়াম পালনের ফরযিয়াত (আবশ্যকীয়তা) মানসূখ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর হিজরী দ্বিতীয় সনে ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত দু'ধরনের

---

* এম. এ., ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

১. ফাতহুল বারী, ৪/১৩২।

২. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৫৯; আবূ দাঊদ, হা/২৩৬৩।

ছিয়ামের প্রচলন ছিল: (ক) আইয়ামুল বীয অর্থাৎ প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে ছিয়াম রাখা। (খ) আশূরার দিন অর্থাৎ ১০ মুহাররমের দিন ছিয়াম রাখা। হিজরী দ্বিতীয় সনে ছিয়াম ফরয হওয়ার পর থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদী দীর্ঘ এক মাসব্যাপী ছিয়াম পালন করে আসছে। পবিত্র রামাযানের ছিয়ামের ক্ষেত্রে পাঁচটি পালনীয় দিক রয়েছে: (১) চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখা, (২) সকাল হওয়ার আগে ছিয়ামের জন্য নিয়্যত করা, (৩) পানাহার ও জৈবিক বিশেষ করে যৌন চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত থাকা, (৪) ইচ্ছাকৃত বমি করা থেকে নিবৃত্ত থাকা ও (৫) ছিয়ামের পবিত্রতা রক্ষা করা।

রামাযান মাসে কতিপয় বিদআত ও সুন্নাত বিরোধী কার্যক্রম : রামাযান মাসে সমাজে একাধিক বিদআত প্রচলিত রয়েছে। যেগুলো এক জায়গায় এক রকম, অন্য জায়গায় আরেক রকম। এক দেশের লোকাচার অন্য দেশ থেকে ভিন্ন। নিম্নে আমাদের দেশে প্রচলিত এ সংক্রান্ত কিছু বিদআতী কাজের চিত্র তুলে ধরব-

(১) রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত এরূপ বিভক্তিকরণ শরীআতে নিষিদ্ধ : রামাযানের প্রথম ১০ দিন রহমত, দ্বিতীয় ১০ দিন মাগফিরাত এবং তৃতীয় ১০ দিন নাজাত বলে মাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাবে না, যা শরীআতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপ রামাযান মাসে একটি সুন্নাত আমল করলে অন্য মাসে ফরয আমল করার মতো নেকী হয় এবং একটি ফরয আমল করলে ৭০টি ফরয আমল করার মতো নেকী হয়। এ বক্তব্যগুলো সঠিক নয়। উক্ত মর্মে যে হাদীছটি সমাজে প্রচলিত আছে, তা যঈফ ও অগ্রহণযোগ্য।[৩] হাদীছটি নিম্নরূপ :

شَهْرُ رَمَضَانَ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ

‘রামাযান মাসের প্রথম অংশ রহমত, মধ্যম অংশ মাগফিরাত ও শেষ অংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তির’। এ হাদীছ মুনকার।[৪] বরং পুরো মাসই রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। কেননা ছিয়ামের কোনো বিকল্প হয় না। মূলত ছিয়ামের নেকীর সাথে অন্য কোনো ইবাদতের তুলনা হয় না। আর তাই এর প্রতিদান আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে দিবেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীছ রয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর মর্জি হলে আদম সন্তানের প্রতিটি সৎকাজের প্রতিদান ১০ গুণ থেকে ৭ শত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তবে ছিয়াম ব্যতীত, তা আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার প্রতিদান দিব। সে তার প্রবৃত্তি ও পানাহার আমার জন্যই ত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দ- একটি আনন্দ তার ইফতারের সময় এবং আরেকটি আনন্দ রয়েছে স্বীয় প্রভু আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাতের সময়। ছিয়াম পালনকারীর ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।[৫]

(২) রামাযানের নতুন চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে বিদআত : রামাযানের নতুন চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু লোক চাঁদের দিকে হাত উঁচু করে শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে থাকে। এটা বিদআত। কেননা কুরআন-সুন্নাহতে এর কোনো ভিত্তি নেই। তবে নতুন চাঁদ দেখলে নিম্নোক্ত দু‘আটি পাঠ করা সুন্নাত :

اللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! এ চাঁদকে আমাদের মাঝে বরকত, ঈমান, শান্তি-নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে উদিত করো। আমার ও তোমার রব আল্লাহ’।[৬]

(৩) সাহরীর আযান ও সাহরী সংক্রান্ত বিদআত : দেখা যায়, রামাযান মাসে শেষ রাতে মুআযযিনগণ মাইকে উচ্চ আওয়াযে কুরআন তেলাওয়াত, গযল, ইসলামী সঙ্গীত ইত্যাদি গাওয়া শুরু করে। অথবা টেপ রেকর্ডার চালিয়ে বক্তাদের ওয়ায, গযল বাজাতে থাকে। সেই সাথে চলতে থাকে ভায়েরা আমার, বোনেরা আমার, উঠুন, সাহরীর সময় হয়েছে, রান্না-বান্না করুন, খাওয়া-দাওয়া করুন ইত্যাদি বলে অনবরত ডাকাডাকি। অথবা কোথাও বা কিছুক্ষণ পরপর উঁচু আওয়াযে হুইশেল বাজানো হয়। এর থেকে আরো আজব কিছু আচরণ দেখা যায়। যেমন : এলাকার কিছু যুবক রামাযানের শেষ রাতে মাইক নিয়ে এসে সম্মিলিত কণ্ঠে গযল বা কাওয়ালী গেয়ে মানুষের বাড়ির দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে চাঁদা আদায় করে। অথবা মাইক বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে। এ ছাড়াও এলাকা ভেদে বিভিন্ন বিদআতী কার্যক্রম দেখা যায়। আমাদের জানা উচিত, শেষ রাতে মহান

৩. বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/১৮৩৯, সনদ ছহীহ।
৪. উকায়লী, কিতাবুয যুআফা, ২/১৬২; ইবনু আদী, আল-কামেল ফী যুআফায়ির রিজাল, ১/১৬৫; ইবনু আবি হাতেম, কিতাবু ই‘লালিল হাদীছ, ১/২৪৯; আলবানী, সিলসিলাতিল আহাদীছুয যঈফা ওয়াল মাওযূআ, ২/২৬২ ও ৪/৭০।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৪, ১৯০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫১।
৬. মুসনাদে আহমাদ, ৩/৪২০; তিরমিযী, ‘চাঁদ দেখার সময় কী বলবে?’ অধ্যায়, আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি ছহীহ।

www.al-itisam.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিচের আসমানে নেমে আসেন। এটা দু'আ কবূলের সময়। আল্লাহ তাআলার নিকট এ সময় কেউ দু'আ করলে তিনি তা কবুল করেন।

মুমিন বান্দাগণ এ সময় তাহাজ্জুদের ছালাত পড়েন, কুরআন তেলাওয়াত করেন, মহান আল্লাহর দরবারে রোনাযারী করে থাকেন। সুতরাং এ সময় মাইক বাজিয়ে, গযল গেয়ে বা চাঁদা তুলে এ মূল্যবান সময়ে ইবাদতে বিঘ্নিত করা নিঃসন্দেহে গুনাহের কাজ। এতে মানুষের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানো হয়। যার ফলে অনেকের সাহরী এমনকি ফজরের ছালাত পর্যন্ত ছুটে যায়। এই কারণে অনেক ছিয়াম পালনকারী সাহরীর শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব না করে আগে ভাগে সাহরী শেষ করে দেয়। এসবগুলোই গুনাহের কাজ। তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে এ ক্ষেত্রে সুন্নাহ কী? প্রকৃতপক্ষে সুন্নাহ হচ্ছে, সাহরীর জন্য দুটি আযান দেওয়া।

দুটি আযান দেওয়া রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত ছিল। রাসূল ﷺ বলেছেন,إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ 'বেলাল রাতে আযান দেয়। অতএব, তোমরা বেলালের আযান শুনলে পানাহার করতে থাকো যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম (ফজরের) আযান দেয়'।[৭] সুতরাং এর বেশি কিছু করতে যাওয়া বিদআত ছাড়া অন্য কিছু নয়। এজন্যই উলামায়ে কেরাম বলেছেন, যখন একটি সুন্নাত উঠে যায়, তখন সেখানে একটি বিদআত স্থান করে নেয়'। আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। সুন্নাত উঠে গিয়ে সেখানে নিজেদের মনগড়া পদ্ধতি স্থান দখল করে নিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে পুনরায় সুন্নাতের দিকে ফিরে আসার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন।

(৪) সাহরী খাওয়ার সময় মুখে নিয়্যত উচ্চারণ করা বিদআত : সাহরী খাওয়া একটি ইবাদত। আর যে কোনো ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য নিয়্যত অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং ছিয়াম রাখার কথা মনের মধ্যে সক্রিয় থাকাই নিয়্যতের জন্য যথেষ্ট। ইসলামী শরীআতে কোনো ইবাদতের নিয়্যত মুখ দিয়ে উচ্চারণের কথা আদৌ প্রমাণিত নয়। অথচ আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ওযূর নিয়্যত, ছালাতের নিয়্যত, সাহরী খাওয়ার নিয়্যত ইত্যাদি চর্চা করা হয়। ছালাত শিক্ষা, ছিয়ামের মাসায়েল শিক্ষা ইত্যাদি বইতে এসব নিয়্যত আরবীতে অথবা বাংলা অনুবাদ করে পড়ার জন্য জনগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, দ্বীনের মধ্যে এভাবে নতুন নতুন সংযোজনের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে আমাদের এই দ্বীনে এমন নতুন কিছু তৈরি করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যাজ্য'।[৮]

আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে যে, কেউ কেউ নিয়্যত করার পরিবর্তে নিয়্যত পড়েন এবং আরবীতে نَوَيْتُ أَنْ أَصُوْمَ غَدًا 'নাওয়াইতু আন আছূমা গাদান' বলে আরবীতে নিয়্যত শুরু করেন এমন করলে কি ছওয়াব বেশি হবে? মূলত নিয়্যত কখনই পড়তে বলা হয়নি; করতে বলা হয়েছে। রাসূল ﷺ ছাহাবায়ে কেরাম এবং চার মাযহাবের ইমামগণ কেউই মুখে মুখে নিয়্যত পড়েননি। কাজেই যারা নিয়্যত পড়েন, মুখে মুখে বলেন এটা শুদ্ধ নয়। আর ছওয়াব বেশি হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো, মনে মনে কল্পনা করে নিয়্যত করা।

'নাওয়াইতু আন' বলে নিয়্যত শুরু করার প্রচলনটা কীভাবে হলো? : কারো কারো ধারণা কায়েদা বাগদাদীর লেখক নিজে থেকে বানিয়ে এটা শুরু করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য বইয়ের লেখকেরা কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই তাদের বইগুলোতেও এগুলো পেশ করেছেন। এগুলোর কোনো অস্তিত্ব বা দলীল কুরআন-হাদীছে কোথাও নেই।

(৫) তারাবীহর ছালাত সংক্রান্ত বিদআত : অনেক মসজিদে দেখা যায়, তারাবীহর ছালাতের প্রতি দুই বা চার রাকআত শেষে মুছল্লীগণ উঁচু আওয়াযে 'সুবহানা যিল জাবারূতে ওয়াল মালাকূতে...' দু'আটি পাঠ করে থাকে। অথচ এটা স্পষ্ট বিদআত। অনুরূপভাবে অন্য কোনো দু'আ এক সাথে উঁচু আওয়াযে পাঠ করাও বিদআত। কারণ, এ ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে কোনো ছহীহ হাদীছ নেই, বরং ছালাত শেষে যে সকল দু'আ ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো পাঠ করা সুন্নাত। যেমন- তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ, একবার আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়ামিনকাস সালাম, তাবারক্তা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' ইত্যাদি। তারাবীহর ছালাতে খুব তাড়াতাড়ি কুরআন তেলাওয়াত করা বা তাড়াহুড়া করে ছালাত পড়া। অনেক মসজিদে রামাযানে তারাবীহর ছালাতে খুব তাড়াতাড়ি কুরআন তেলাওয়াত করা বা তাড়াহুড়া করে ছালাত শেষ করা হয়, যার কারণে তেলাওয়াত ঠিক মতো বুঝাও যায় না। ছালাতে

৭. ছহীহ বুখারী, 'ফজরের আগে আযান দেওয়া' অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, 'ফজর উদিত হলে ছিয়াম শুরু হবে...' অনুচ্ছেদ।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮, ৪৫৯০।

ঠিকমতো দু'আ-যিকিরও পাঠ করা যায় না। এটা নিঃসন্দেহে সুন্নাত পরিপন্থী। কেননা, আল্লাহর নবী ﷺ-এর রাতের ক্বিয়ামুল লায়ল হতো অনেক দীর্ঘ এবং ধীরস্থিরভাবে।

(৬) বদর দিবস পালন করা বিদআত : প্রতি বছর রামাযানের ১৭ তারিখে এ ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য লোকজন একত্রিত হয়ে কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। তারপর বদরের বিভিন্ন ঘটনা, ছাহাবীদের সাহসিকতা ইত্যাদি আলাচনা কর হয়। এভাবে প্রতি বছর এই দিনে 'বদর দিবস' পালন করা হয়। যদিও আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে এটির প্রচলন তেমন নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের কিছু ইসলামী সংগঠন প্রতি বছর বেশ জোরেশোরে সাংগঠনিক কার্যক্রম হিসেবে এই বিদআত পালন করে থাকে। অথচ উম্মাতে মুহাম্মাদীর সর্বোত্তম আদর্শ ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং আতবাউত তাবেঈন থেকে এ জাতীয় অনুষ্ঠান পালনের কোনো ভিত্তি নেই। বদরের এ ঘটনা নিঃসন্দেহে মুসলিমদের প্রেরণার উৎস। এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এভাবে দিবস পালন করা শরীআত সম্মত নয়।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা রহিমাহুল্লাহ বলেন, নবী ﷺ-এর নবুঅত জীবনে রয়েছে অনেক বক্তৃতা, সন্ধি, চুক্তি এবং বিভিন্ন বড় বড় ঘটনা, যেমন- বদর, হুনাইন, খন্দক, মক্কা বিজয়, হিজরত মুহূর্ত, মদীনায় প্রবেশ, বিভিন্ন বক্তৃতা যেখানে তিনি দ্বীনের মূল ভিত্তিগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও তিনি তো এ দিনগুলোকে আনন্দ-উৎসব হিসাবে পালন করা আবশ্যক করেননি। বরং এ জাতীয় কাজ খ্রিষ্টানরা করে। তারা ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে উৎসব হিসেবে পালন করে থাকে। অনুরূপভাবে ইয়াহূদীরাও এমনটি করে। ঈদ বা উৎসব হলো শরীআতের একটি বিধান। আল্লাহ তায়ালা শরীআত হিসেবে যা দিয়েছেন তা অনুসরণ করতে হবে। অন্যথা এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করা যাবে না, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৯] সুতরাং শরীআত যে কাজ করতে আদেশ করেনি, তা হতে দূরে অবস্থান করে রামাযান মাসে অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত করা, নফল ছালাত আদায় করা, যিকির-আযকার এবং অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী বেশি বেশি করা দরকার। কিন্তু মুসলিমদের অন্যতম সমস্যা হলো শরীআত অনুমোদিত ইবাদত বাদ দিয়ে নবাবিষ্কৃত বিদআতী আমল নিয়ে ব্যস্ত থাকা। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন- আমীন।

৯. ইকতিযাউয ছিরাতিল মুস্তাক্বীম, পৃ. ২/৬১৪ ও ৬১৫।

(৭) ই'তিকাফ সংক্রান্ত ভুল ধারণা : ই'তিকাফ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর নবী ﷺ প্রতি রামাযানের শেষ ১০ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের দেশে মনে করা হয় যে, সমাজের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে অবশ্যই ই'তিকাফে বসতে হবে, তা না হলে সবাই গুনাহগার হবে। কিন্তু এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। বরং এটি ব্যক্তিগত ইবাদত।

(৮) জুমআতুল বিদা পালনের বিদআত : আমাদের দেশে দেখা যায়, রামাযানের শেষ শুক্রবারে জুমআতুল বিদা পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে জুমআর ছালাতে প্রচুর ভিড় পরিলক্ষিত হয়। অথচ কুরআন-সুন্নাহয় এ ব্যাপারে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। আমাদের কর্তব্য প্রত্যেক জুমআকে গুরুত্ব দেওয়া। শেষ জুমআর বিশেষ কোনো ফযীলত আছে বলে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর এ ধরনের প্রথা উদ্ভাবন করা মানেই বিদআত প্রচলন করা। যেমন এ প্রসঙ্গে হাদীছ এসেছে। হাদীছটি নিম্নরূপ :

فَإِنَّ خَيْرَ الأُمُورِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

'সবচেয়ে ভালো বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর সবচেয়ে ভালো নিয়ম হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিয়ম। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হলো (দ্বীনের ব্যাপারে) বিদআত বা নতুন কিছু সৃষ্টি করা। আর প্রতিটি বিদআত (নতুন সৃষ্টিই) হলো ভ্রষ্টতা। এরপর তিনি বলতেন, 'আমি প্রতিটি মুমিনের জন্য তার নিজের চাইতেও উত্তম'।[১০]

উক্ত হাদীছের আলোকে বলা যায় যে, জুমআতুল বিদা রাসূল ﷺ-এর যুগে ছিল না। আর ছিল না বলেই এটা বিদআত। এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিকভাবে সঠিক পদ্ধতিতে ইবাদত করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন।

(৯) ফিত্বরা প্রদানের ক্ষেত্রে সুন্নাতের বরখেলাপ : খাদ্যদ্রব্য না দিয়ে টাকা দিয়ে অথবা কাপড় কিনে ফিত্বরা দেওয়া সুন্নাতের বরখেলাপ। কারণ, হাদীছে ফিত্বরা হিসাবে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করার কথাই বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَرَضَ رَسُولَ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ 'রাসূল ﷺ মুসলিমদের প্রত্যেক স্বাধীন, দাস, পুরুষ অথবা নারী

১০. ইবনু মাজাহ, হা/৪৫; নাসাঈ, হা/১৫৭৮, ১৯৬২; আবূ দাঊদ, হা/২৯৫৪; আহমাদ, হা/১৩৭৪৪; দারেমী, হা/২০৬।

www.al-itisam.com

সকলের উপর এক ছা‘ (প্রায় আড়াই কেজি) পরিমান খেজুর অথবা যব যাকাতুল ফিত্বর হিসাবে আবশ্যক করেছেন’।[১১] এখানে খাদ্যদ্রব্যের কথা সুস্পষ্ট। তাছাড়া নবী ﷺ-এর যুগেও দীনার-দিরহামের প্রচলন ছিল, কিন্তু তিনি অথবা তার কোনো ছাহাবী দীনার-দিরহাম দ্বারা ফিত্বরা আদায় করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। তাই সুন্নাত হলো আমাদের দেশের প্রধান খাদ্যদ্রব্য (যেমন- চাউল) দ্বারা ফিত্বরা আদায় করা। আরেকটি বিষয় হলো, হাদীছে বর্ণিত এক ছা‘-এর পরিবর্তে আধা ছা‘ ফিত্বরা দেওয়াও সুন্নাতের বরখেলাপ। যেমনটি উপরিউক্ত হাদীছে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। যদিও আমাদের সমাজে আধা ছা‘ ফিত্বরা দেওয়ার মাসআলাই দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা সকল ক্ষেত্রে তার নবী ﷺ-এর সুন্নাতকে যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক্ব দান করুন এবং সকল বিদআত ও সুন্নাত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে হেফাযত করুন- আমীন।

(১০) ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহা তিন দিন কথাটা কতটুকু শরীআত সম্মত? : ঈদুল ফিত্বর শুধু এক দিন। সে দিনটি হলো শাওয়াল মাসের প্রথম দিন। হাদীছে এসেছে, আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহার- এ দুদিনে ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন এবং এমনভাবে পুরুষের জন্য এক প্রস্থ কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন, যাতে হস্তপদ পাথরের মতো নিশ্চল থাকে এবং তিনি সকাল হবার পর (দুই রাকআত সুন্নাত ব্যতীত অন্য ছালাত) এবং আছরের পরে ছালাত পড়তে নিষেধ করেছেন।[১২]

অতএব, উক্ত দলীলের ভিত্তিতে ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহা হলো এক দিন। সেদিন ছিয়াম রাখা শরীআতে হারাম। তাই শাওয়াল মাসের দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিন ছিয়াম রাখা হারাম নয়। তাই সে দুটি দিনে রামাযানের ক্বাযা রাখা, নফল ছিয়াম রাখা তথা শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম রাখা জায়েয রয়েছে।

উপসংহার : রামাযান হলো খালেছ ইবাদতের মৌসুম। তাই এ মাসের সময়গুলো যতটা শুধু আল্লাহর সাথে কাটানো যায় ততটাই কল্যাণ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে রামাযান ও ছিয়ামের ফযীলত লাভ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন।

১১. ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৪।

১২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৯২; আবূ দাঊদ, হা/২৪১৭।

সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ

রাসূল ﷺ বললেন, আমীন!’ *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/১৮৮৮)*। এরপরও কতিপয় মুনাফালোভী রামাযান মাসে দিনের বেলা খাবারের হোটেল-রেস্টুরেন্ট খুলে রেখে মানুষকে ছিয়াম তরক করার সুযোগ করে দেয়। আবার সারা বছর ইচ্ছামতো লাভ করার পর গণমানুষের সুবিধার কথা বিবেচনা করে রামাযান মাসে যেখানে লাভ একটু কম করার কথা, সেখানে আমাদের এ আজব দেশে প্রায়ই ব্যবসায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। অথচ আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে একে-অন্যকে সহযোগিতা করো। আর পাপকর্ম ও আল্লাহদ্রোহিতার কাজে একে-অন্যকে সহযোগিতা করো না’ *(আল-মায়েদা, ৫/২)*।

আনুগত্যে অবিচল থাকা কিংবা মনের সাথে আপসহীন যুদ্ধ করে পাপকাজ থেকে নিজেকে নিবৃত রাখাসহ ধৈর্যের যত দিক হতে পারে, তার সবগুলোই ছিয়ামের মধ্যে পাওয়া যায়। সকল আমলের মধ্যে লৌকিকতার আবেশ থাকতে পারে। কিন্তু ছিয়াম তার থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এজন্যই রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘আদম সন্তানের প্রতিটি আমলই দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ বলেন, শুধু ছিয়াম ছাড়া। তা একমাত্র আমার জন্য। তাই এর প্রতিদানও আমি দিব। কারণ আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সে প্রবৃত্তিকে দমন করেছে, খাবার থেকে বিরত থেকেছে’ *(বুখারী, হা/৭৪৯২; মিশকাত, হা/১৯৫৯)*। প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার পাওয়া কত যে আনন্দের, তা কি ভাষায় প্রকাশ করার মতো? আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের তাই করবেন। কল্পনা করুন! সেই মুহূর্তটা কত আনন্দের হবে।

পরিশেষে মহান রবের কাছে দু‘আ করি, তিনি যেন আমাদের রামাযানের সকল শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে যথাযথভাবে ছিয়াম পালন করে তার হাত থেকে উপহার গ্রহণ করার তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!

আপনার সমীপে আপনার আমানত!

*-মীযান মুহাম্মদ হাসান**

লিখার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত না হলেও আজ বড় ব্যথিত হৃদয় ও ভগ্ন মন নিয়ে লিখতে হচ্ছে। কারণ রূযীর তাড়না যাদের তাড়িয়ে ফেরে, তারা কী করে গবেষণার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের আঞ্জাম দিবেন? কীভাবে এইরূপ উদ্ভাবন বা আবিষ্কারমূলক কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে?

কীভাবে তাদের কলম চলবে? দু'মুঠো অন্নের জন্য যাদেরকে আজ কর্তৃপক্ষের গোলামি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও অনেক সময় তাঁদের নির্ধারিত পারিশ্রমিক পরিশোধের ব্যবস্থা হয় না। মাদরাসার শিক্ষকের ক্ষেত্রে সচরাচর এমন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এভাবেই অনাহারে-অর্ধাহারে লাখো আলেমকে অতিবাহিত করতে হচ্ছে জীবিকা উপার্জনের তাঁদের সংগ্রামী জীবন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই যাদের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, দিন শেষে তারাই হলেন এই পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্র।

সূরা ফাতিহা শুদ্ধ করে পাঠ করার মতো সৎ সাহস না থাকলেও আলেমের বিরুদ্ধে কর্তৃত্ব প্রদর্শনে তারা যথেষ্ট সিদ্ধহস্ত। যেন বাপের টাকায় কেনা গোলাম বেচারা ইমাম-মুআযযিন! যা-ই হোক এজন্যই সৎ সাহস দেখিয়ে কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক আলোচনা ও হালাল-হারাম সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ সব আলেমের নেই। দিন দিন এ অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। কোণঠাসা করা হচ্ছে আলেম সমাজকে।

হে আলেম সমাজ! আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে নবুওয়াতের ইলম অর্জনের জন্য কবুল করেছেন। আপনাদের কারও ইলম যদিও মধ্যম স্তরের হয়, তবুও রূযী অন্বেষণের পাশাপাশি আপনার সহকর্মীর পরামর্শে নিজের/ উম্মাতের কল্যাণ সাধনে সময় ব্যয় করুন। দু'আয়, কান্নায় ও তাহাজ্জুদে তাদের ঈমানের উপর অটল, অবিচল ও স্থায়ী থাকার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করুন ।আর যদি আল্লাহ তাআলা আপনাকে উচ্চ স্তরের ইলম দান করে থাকেন, সাথে আপনি যদি ভালো মানের আলেম হয়ে থাকেন, তবে জেনে রাখুন! আপনার যিম্মাদারি অনেক বেশি। দ্বীনের সঠিক দাওয়াত দেওয়া আপনার আমানত।

যাদের তাখাছছুছ ফিল ফিক্বহে বা শরঈ মাসআলার ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হয়েছে, তাঁরা ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েল অধ্যয়ন ও গবেষণায় বেশি বেশি সময় ব্যয় করুন। যাদের উলূমুল হাদীছে তাখাছছুছ বা বিশেষ জ্ঞান লাভের সুযোগ হয়েছে, তাঁরা এ ক্ষেত্রে আরও বেশি গুরুত্বসহ অধ্যয়ন করুন। আলোচনা, বয়ান ও বক্তৃতায় সর্বত্র হাদীছে নববীর প্রমাণিকতাকে তুলে ধরুন।

ফেতনার বিস্তার আজ সর্বত্র লক্ষণীয়। কেউ কুরআনকেই মুক্তির একমাত্র মাধ্যম মনে করেন; যেখানে হাদীছের অনুসরণ তাঁর নিকট নিষ্প্রয়োজন। আবার দল-মত প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অনেককে হাদীছ অস্বীকার করতে বাধ্য করেছে। বর্তমানে মানুষ যেভাবে প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়েছে, ঠিক সেইভাবে বাতিল আক্বীদায় বিশ্বাসীরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাধারণ জনগণকে প্রতিনিয়ত ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভুমিকাও এ ক্ষেত্রে কম নয়।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে ভাববার সময় কী এখনও আসেনি? কুরআন ভিত্তিক ইসলাম প্রচারের নামে ইসলামের অপব্যাখ্যাকারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার সময় কী এখনও হয়নি? কুরআন ভিত্তিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে আহলে কুরআন কর্তৃক কুরআনের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। সুন্নাত, ওয়াজিব, ফরয ইত্যাদি ইবাদতের প্রতি মানুষের হৃদয়ে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। দাড়ি, টুপি ও বোরকা ইসলামী পোশাক বা সংস্কৃতি নয় বলে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো কুরআনের অপব্যাখ্যাকেই হাদীছ অস্বীকারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কুরআন বোঝার জন্য তাফসীর গ্রন্থকে আবশ্যক মনে করা হলেও সুকৌশলে মস্তিষ্ক প্রসূত যুক্তির মাধ্যমে হাদীছকে অস্বীকার করা হচ্ছে। তাঁরা কি সূরা আন-নাজমের এ আয়াতদ্বয় সম্পর্কে জানে না? 'তিনি মনগড়া কিছুই বলেন না। কেবল যা অহি করা হয়, শুধু তাই তিনি বলেন' *(আন-নাজম, ৫৩/৩-৪)*।

* সাবেক খত্বীব, বৈরাগীরচালা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, শ্রীপুর, গাজীপুর।

অন্তত এ আয়াত দুটি সম্পর্কে যাদের নূন্যতম জ্ঞান আছে, তারা হাদীছ অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস দেখাবে না?

বলা হচ্ছে, কুরআনেই সব কিছু আছে। এর বাইরে হাদীছকে কুরআনের মতো মান্য করা বা অনুসরণ করা যাবে না। এমনকি হাদীছকে ঐতিহাসিক বক্তব্য বলে অপপ্রচার করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ঐতিহাসিক বক্তব্য দলীল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। ইমাম ইবনু মাজাহ (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতো স্বনামধন্য মুহাদ্দিছকে অস্বীকার করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এই নামে কোন মুহাদ্দিছের আবির্ভাব হয়নি। এই জাতীয় তথ্য সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য ইংরেজি ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কুরআনের ইংরেজি অনুবাদে এ জাতীয় কৌশল সবচেয়ে বেশি আবলম্বন করা হচ্ছে।

তারা যদি 'আল-ইমাম ইবনু মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান' কিংবা 'ইমাম ইবনু মাজাহ আওর উলূমুল হাদীছ' পড়তেন, তবে হয়ত তারা এ জাতীয় মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতেন।

আবার কুতুবে সিত্তাহ বা ছয়টি হাদীছ গ্রন্থ সংগ্রহে রাখা নাকি একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। তবে যারা এই জাতীয় কর্মে লিপ্ত, তারা কী কুতুবে সিত্তাহ কী তা জানেন? এদের মূল উদ্দেশ্য কী? এরা কি ওরেন্টালিস্ট নয়? তবে কি এদের মাধ্যমে সুকৌশলে হাদীছকে অস্বীকার করা হচ্ছে না?

উলূমুল হাদীছের পাঠ আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা এখন সময়ের অন্যতম অনিবার্য দাবি হয়ে উঠেছে।

হায়! এরা কি উলূমুল হাদীছও অস্বীকার করবে? অথচ যুগ যুগ ধরে এই বিষয়ের চর্চা হয়ে আসছে সারা পৃথিবী জুড়ে। এদের কার্যক্রম এখানেই শেষ নয়। এরা ইদানিং ফিক্বহের ইমামদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়া শুরু করেছে। এমন কি এরা ফিক্বহের ফৎওয়া শাস্ত্রকেও অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

হে উম্মাতের কান্ডারি আলেম সমাজ! তাই পরিশেষে এই একটি কথা বলে শেষ করতে চাই। তা হলো- সোশ্যাল মিডিয়া আকৃষ্ট, প্রযুক্তি প্রেমিক ও ইউটিউব নির্ভর জাতিকে রক্ষা করতে কুরআন-হাদীছের রেফারেন্সভিত্তিক প্রচুর প্রবন্ধ ও ভিডিও তৈরি ও সম্প্রচার করতে হবে। যাদের ইউটিউবে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় চ্যানেল আছে বিতর্কিত বিষয় বর্জন করে তাদের এই জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিত। এতে উম্মত উপকৃত হবে। গোমরাহি থেকে বহু লোক মুক্তি পাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআন, হাদীছ, দ্বীন, ঈমান, আক্বীদা ও ইসলাম সম্পর্কে নানারূপ বিভ্রান্তি থেকে হেফাযত করুন- আমীন।

সংশোধনী

১. মাসিক আল-ইতিছাম ফেব্রুয়ারি, ২০২১-এর ১০ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল 'জাদু করা একটি ধ্বংসাত্মক পাপ। তবে জাদুকৃত ব্যক্তি হতে জাদুর প্রভাব দূর করার নিয়্যতে প্রতিরোধক জাদু বৈধ'। প্রকৃতপক্ষে জাদু হচ্ছে শয়তানের কাজ এবং কুফুরী *(আল-বাক্বারা, ২/১০২)*। ইসলামে সর্বসম্মতিক্রমে জাদু প্রত্যাখ্যাত, আক্বীদা বিনষ্টকারী কর্ম, যার মাধ্যমে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। জাদু হচ্ছে স্পষ্ট শিরক, যা শিক্ষা করা ও শেখানো এবং প্রদর্শন করা নিকৃষ্টতম হারাম *(ইবনু ইছায়মীন, ২/৭০)*। ইবনুল ক্বায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জাদু দিয়ে জাদুর চিকিৎসা করা শয়তানের কাজ *(ফতওয়া ইমামুল মুফতিঈন, পৃ. ২০৭-২০৮)*। তাছাড়া মহান আল্লাহ কোনো হারাম জিনিসের মধ্যে আরোগ্য রাখেননি *(ছহীহ বুখারী, অধ্যায়-১৫; ইবনু হিব্বান, হা/১৩৯১; বায়হাক্বী, হা/২০১৭১; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৬৩৩)*। তাই হারাম জিনিস দ্বারা আরোগ্যের জন্য চিকিৎসা করা যাবে না। সে জন্যই রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে যখন কুচক্রী ইয়াহূদী কর্তৃক জাদু করা হয়েছিল তখন তিনি আরোগ্যের জন্য কোনো জাদুর আশ্রয় নেননি। বরং আল্লাহ প্রদত্ত সূরা নাস ও ফালাক্ব দ্বারা চিকিৎসা করেছিলেন।

২. মাসিক আল-ইতিছাম জানুয়ারি, ২০২১ সংখ্যার ২৩ নং পৃষ্ঠায় মহিলাদের পোশাকের শর্তাবলি শিরোনামে ১নং আলোচনায় 'বেগানা' শব্দের ব্যাখ্যায় বন্ধনির ভেতর লেখা হয়েছিল, 'যার সাথে কোনোও সময়ে বিবাহ বৈধ নয় এমন'। এখানে **'নয়'** শব্দটি ভুলে যুক্ত হয়ে যায়। মূলত হবে 'যার সাথে কোনোও সময়ে বিবাহ বৈধ এমন'।

এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। -প্রধান সম্পাদক

‘আমি আগামীকাল তা করব’ বলার শিষ্টাচার

*[১৪ রজব, ১৪৪২ হি. মোতাবেক ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১। পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. আব্দুল বারী বিন আওয়াদ্ব আছ-ছুবায়তী** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত মুহাদ্দিছ ও ‘আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ’-এর গবেষণা সহকারী **শায়খ আব্দুল বারী বিন সোলায়মান**। খুৎবাটি **‘মাসিক আল-ইতিছাম’**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]* [১]

প্রথম খুৎবা

আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যাঁর প্রশংসার কোনো সীমা নেই। আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি- তাঁর পথে চলার মতো এত সুন্দর নেয়ামত দান করার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি বলেছেন, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ‘আর কোনো বিষয়ে কখনোই বলো না যে, আমি আগামীকাল তা করব’ *(আল-কাহফ, ১৮/২৩)*। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি ছালাত, ছিয়াম ও ক্বিয়াম এত বেশি করতেন যে তার পা পর্যন্ত ভুলে যেত। আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন তার প্রতি এবং তার পরিবারবর্গ ও কিয়ামত পর্যন্ত তার সকল অনুসারীদের উপর।

অতঃপর, সর্বপ্রথম আমি নিজেকে এবং আপনাদের আল্লাহভীতির ব্যাপারে অছিয়ত করছি। কারণ গোপনে, প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করাই নাজাতের মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো। আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না’ *(আলে ইমরান, ৩/১০২)*।

জীবন চলার পথে মানুষ বারবার যে শব্দটি আওড়িয়ে থাকে তা হলো- **‘আমি আগামীকাল তা করব’**। তার মনের মধ্যে থাকা পরিকল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সুস্থতা, নিরাপত্তা, প্রাচুর্য, ধন-সম্পদ, প্রশস্ত বাড়ি, উন্নত গাড়ি, পদ-পদবী ইত্যাদি যা কিছু কামনা করে সেক্ষেত্রে এ শব্দটি উচ্চারণ করে থাকে। কিন্তু ইসলাম এ সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা কিংবা প্রত্যাশার ভাষাটি কীভাবে বলতে হয় তারও শিষ্টাচার শিখিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا - إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ‘আর কোনো বিষয়ে কখনোই বলো না যে, আমি আগামীকাল তা করব। ‘আল্লাহ চাইলে’ এ কথা বলা ছাড়া। যদি ভুলে যাও (তবে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে) তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো। আর বলো ‘আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে এর চেয়েও সত্যের নিকটবর্তী পথে পরিচালিত করবেন’ *(আল-কাহফ, ১৮/২৩-২৪)*।

‘আমি আগামীকাল তা করব’ কথাটি বলার ক্ষেত্রে উক্ত শিষ্টাচারের মূল রহস্য হলো, সেই পরিকল্পনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে জুড়ে দেওয়া। কারণ মানব জীবনের সবকিছুর প্রত্যাবর্তনস্থল হলো আল্লাহর ইচ্ছার কাছে। আর এই চিন্তাই একজন মুসলিমকে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর তাওফীক্ব ও সাহায্যের উপর ভরসা করতে শেখায়।

মুসলমান যে কাজই করুক না কেন তার শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা নির্ভর করে নিয়্যতের উপরে। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘সকল কাজের প্রতিফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক মানুষের জন্য তাই রয়েছে, যা সে নিয়্যত করে’। [২]

‘আমি আগামীকাল তা করব’ কথাটি বলার আরেকটি শিষ্টাচার হলো, কোনো কাজ করার দৃঢ় সংকল্প করার সময় ইস্তেখারা তথা আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করা। কারণ ইস্তেখারা ভবিষ্যতের পথকে আলোকিত করে, সফলতার জায়গা দেখিয়ে দেয় এবং পথচলাকে সঠিক ও সুন্দর করে। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কুরআনের সূরা শেখানোর মতো করে ইস্তেখারা শিখিয়ে দিতেন। [৩] যখন কেউ কোনো কাজের সংকল্প করে বলে ‘আমি আগামীকাল তা করব’, তখন দৃঢ়প্রত্যয়ী ব্যক্তি সময়কে গনীমত মনে করে এবং সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তা সম্পন্ন করার জোর প্রচেষ্টা চালায়। তার সংকল্প থেকে সরে কখনো আসে না কিংবা লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত থাকে না- যেন তার জীবনের ডায়ারিতে ফলপ্রসূ কর্মের প্রবাহ ও উজ্জ্বল সাফল্যের অধ্যায় সংযোজিত হয়। আল্লাহ বলেন, ‘যখন তুমি কোনো কাজের দৃঢ় সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর ভরসা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন’ *(আলে ইমরান, ৩/১৫৯)*।

১. আল-কাহফ, ১৮/২৩।

২. ছহীহ বুখারী, হা/১; মিশকাত, হা/১।

৩. আবূ দাঊদ, হা/১৫৩৮; ছহীহ বুখারী, হা/১১৬২।

‘আমি আগামীকাল তা করব’ মানুষ এ শব্দটি আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে আওড়িয়ে থাকে। কিন্তু যদি এতে দুর্বার স্পৃহা এবং চূড়ান্ত ইচ্ছার সম্মিলন না ঘটে, তাহলে এর কোনো মূল্য থাকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বুদ্ধিমান হলো সেই লোক, যে মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে। আর অপারগ হলো সে লোক, যে মনের চাহিদার পিছনে ছুটে বেড়ায় এবং সে আল্লাহর কাছে অলীক আশা পোষণ করে’।[৪]

যাকে আল্লাহ সক্ষমতা দান করেছেন, তারপরও কাজ না করে বসে থাকে; সে মূলত নিজেকে অলসতার দিকে ঠেলে দেয়, জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে, কাফেলার পিছনে থেকে সন্তুষ্ট থাকে আর জীবনের প্রান্তসীমায় নিজেকে অকর্মণ্য প্রমাণ করে। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘তোমাদের কেউ যেন রিযিক্ব সন্ধান না করে বসে না থাকে’। তিনি আরো বলেছেন, ‘হে আল্লাহ! আমাকে রিযিক্ব দান করো’। (অতঃপর লোকদের লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন), ‘তোমরা জানো আকাশ কখনো স্বর্ণ-রৌপ্য বর্ষণ করে না’। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ‘যখন ছালাত শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক্ব) তালাশ করো’ *(আল-জুমআ, ৬২/১০)*।

‘আমি আগামীকাল তা করব’ কতইনা উত্তম কথা! কতইনা উত্তম এর কথক! কতইনা উত্তম কাজ! কতইনা উত্তম এর কর্তা! যদি তা হয় সৎকর্ম সাধনের ময়দানে কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা এবং পুণ্য ও ইহসানের কাজে আত্মনিয়োগ করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। আল্লাহ তাআলা বলেন, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ‘তোমরা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করো’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৪৮)*।

তিনি আরো বলেছেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ‘আর তোমরা দৌড়িয়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং ওই জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাক্বীদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন’ *(আলে ইমরান, ৩/১৩৩-১৩৪)*।

রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘সৎকর্ম মানুষকে অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে, গোপন দান আল্লাহর ক্রোধকে মিটিয়ে দেয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা মানুষের বয়স বৃদ্ধি করে। আর প্রতিটি ভালো কাজই ছাদাক্বা (দান)। দুনিয়াতে যারা ভালো কাজ করবে, পরকালে তারা ভালো বলেই বিবেচিত হবে’।[৫]

সংকল্প করার ক্ষেত্রে ইসলামের শিষ্টাচার হলো, কোনো মানুষ যেন এমন কাজের সংকল্প না করে, যা তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় অথবা বিপদ, দুর্দশা ও পরীক্ষার চুল্লিতে নিক্ষেপ করে।

‘আমি আগামীকাল তা করব’ অতি উত্তম বাণী, পবিত্র আত্মা থেকে নির্গত ধ্বনি- যদি তা হয় তোমার আত্মশুদ্ধি, সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন, নিষ্ঠার সাথে কর্মসম্পাদন, জমি চাষাবাদ এবং দেশ ও জাতির উন্নয়নে জীবনের আদর্শ ও কর্ম সম্পাদনের কার্যক্রম। আল্লাহ বলেন, ‘তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন’ *(হূদ, ১১/৬১)*। তাই যখন তুমি বলবে ‘আমি আগামীকাল তা করব’, অতঃপর কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান হাছিল করলে, সফলতা অর্জন করলে, সম্পদ উপার্জন করলে অথবা সফলতার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে গেলে তখন ইসলামের শিষ্টাচার হলো, এই অনুগ্রহকে অনুগ্রহদাতার দিকে সম্বোধন করা এবং নেয়ামতকে নেয়ামত থেকে সম্বোধন করা। চিন্তা করে দেখো, একজন সৎ বান্দা ও আল্লাহ প্রেরিত নবীর আদব কেমন ছিল? আল্লাহ তাআলা তার সম্পর্কে বলেন, فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ‘অতঃপর সুলাইমান যখন তা সামনে স্থির অবস্থায় দেখলেন তখন বলল, এ আমার রবের অনুগ্রহ’ *(আন-নামল, ২৭/৪০)*।

ইসলামের রঙে রঙিন ব্যক্তি যদি বলে **‘আমি আগামীকাল তা করব’** তখন কথার ক্ষেত্রে সর্বদা সে সত্যকে আঁকড়ে ধরে। বাহিরের সাথে তার ভেতরের মিল থাকে। কথার সাথে কর্মের সামঞ্জস্য থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অতঃপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করত, তবে তাদের জন্য তা অবশ্যই কল্যাণকর হতো’ *(মুহাম্মাদ, ৪৭/২১)*। শারঈ শিষ্টাচার ও নববী আদর্শ এটা নয় যে, কোনো ব্যক্তি বলবে ‘আমি আগামীকাল তা করব’, আর মনে তা ভঙ্গ করার ইচ্ছা রাখবে কিংবা ওয়াদাকৃত বিষয়ে গড়িমসি করবে। আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ওয়াদা পূরণ করো’ *(আল মায়েদা, ৫/১)*। তিনি আরো বলেন, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

৪. তিরমিযী, হা/২৪৫৯; মিশকাত, হা/৫২৮৯, হাদীছটি যঈফ।

৫. ছহীহুল জামে‘, হা/৩৭৯৬, হাদীছ ছহীহ।

www.al-itisam.com

مَسْئُولًا ‘তোমরা ওয়াদা পূরণ করো। কারণ ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে’ *(আল ইসরা, ১৭/৩৪)*। এর চেয়ে আরো ভয়ংকর অভ্যাস হলো, কসম ও শপথের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে সেই কসম ভঙ্গ করা। আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তাআলা বলেন, ‘আর তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো- যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর। আর তোমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, যা তোমরা কর। *(আন-নাহল, ১৬/৯১)*।

যখন মুসলিম ব্যক্তি বলে **‘আমি আগামীকাল তা করব’**, এর মাধ্যমে সে যেন ভবিষ্যতের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প না করে। *(অর্থাৎ আমি অবশ্যই তা সম্পাদন করতে পারব, এমন বিশ্বাস যেন না রাখে। -অনুবাদক)*। কারণ ভবিষ্যৎ হলো গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়। যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আল্লাহ বলেন, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ‘হে নবী! বলে দিন, আসমান যমীনে যারা আছে, আল্লাহ ব্যতীত তাদের কেউই গায়েব সম্পর্কে জানে না’ *(আন-নামল, ২৭/৬৫)*। অনুরূপভাবে **‘আমি আগামীকাল তা করব’** একথা বলে বান্দা ভুল করে, যখন সে জাদুকর কিংবা জ্যোতিষীর কথার উপর ভরসা করে। যা তাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহর কাছে এর থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। নবী ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জাদুকর কিংবা গণকের কাছে আসলো এবং তার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল সে মুহাম্মাদ এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল’।[৬]

‘আমি আগামীকাল তা করব’ কথাটি আবার কখনো তার কথকের ধ্বংস ও ক্ষতি ডেকে আনে; যখন এর মাধ্যমে সে প্রবৃত্তি ও সংশয়ের মধ্যে ডুবে যায় এবং পাপ থেকে তওবা করার কাজটি দিনের পর দিন বিলম্ব করতে থাকে এই বলে যে, আগামীকাল তা করব। শেষপর্যন্ত তার কাছে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়ে যায়। তখন অনুশোচিত হয়ে চিৎকার করে বলে, رَبِّ ارْجِعُونِ - لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ‘হে আমার রব! আমাকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দাও, যেন আমি সৎকর্ম করে আসতে পারি, যা আমি ছেড়ে এসেছিলাম’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৯৯-১০০)*। সে আরো বলতে থাকে, ‘হায় আফসোস! যদি আমার পরকালীন জীবনের জন্য কোনো কিছু প্রেরণ করতাম’ *(আল-ফাজর, ৮৯/২৪)*।

দ্বিতীয় খুৎবা

হামদ ও ছালাতের পর...। আমি নিজেকে ও আপনাদের আল্লাহভীতির অছিয়ত করছি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তুমি তোমার রবকে স্মরণ করো। যখন ভুলে যাও’ *(আল-কাহফ, ১৮/২৪)*।

মুসলিম ব্যক্তি কখনো কখনো ভুলে যাওয়ার কারণে বহু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়। আর ভুলে যাওয়ার ওষুধ হলো সর্বদা আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকা। যে ব্যক্তি বলে **‘আমি আগামীকাল তা করব’** সে কোনোদিন তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পৌঁছাতে পারে না। পারলেও সামান্যই পারে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যর্থতাই ধ্বংস ডেকে আনে। আর অকর্মণ্যতা কবেই বা সফলতা এনেছে।

আবার অদৃশ্য বিষয়টি কখনো কখনো হাতছাড়া হয়ে যাওয়া বিষয়টির চেয়ে উত্তম হতে পারে। সুতরাং যা হারিয়ে ফেলেছো তার জন্য চিন্তিত হয়ো না। কারণ বান্দা কখনো কখনো আপতিত বিপদের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কল্যাণের রহস্য জানতে পারে না। আল্লাহ বলেন, ‘আর বলো, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে এর চেয়েও সত্যের নিকটবর্তী পথে পরিচালিত করবেন’ *(আল-কাহফ, ১৮/২৩-২৪)*। রাসূল ﷺ বলেন, ‘যা তোমার উপকারে আসবে তা অর্জনে আগ্রহী হও। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, সাহায্য চাইতে অক্ষম হয়ো না। আর যদি তোমার কোনো বিপদ হয় তাহলে এ কথা বলো না যে, যদি আমি ওটা করতাম, তাহলে এমন এমন হতো। বরং বলো, যা হয়েছে তা হলো আল্লাহর তাক্বদীর, তিনি যা চান তাই করেন। কারণ ‘যদি’ শব্দটি শয়তানের কাজের রাস্তা খুলে দেয়’।[৭]

আল্লাহর বান্দাগণ! হেদায়াতের বার্তাবাহক রাসূল ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করুন। কারণ আল্লাহ তাঁর আদেশ দিয়ে বলেছেন, إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ‘আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী নবীর উপর পড়ে। অতএব ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর প্রতি দরূদ পড়ো এবং সালাম প্রেরণ করো’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৬)*। এরপর তিনি দরূদে ইবরাহীম পাঠ করেন। চার খলীফার জন্য দু‘আ করেন এবং ইসলাম ও সমগ্র মুসলিমদের শক্তিশালী করা এবং কুফর ও কাফেরদের অপমানিত ও লজ্জিত করার দু‘আ করেন। আল্লাহর শত্রু ও তাঁর দ্বীনের শত্রুদের ধ্বংস করা এবং মক্কা-মদীনা ও সমগ্র মুসলিম জাহানের নিরাপত্তার জন্য দু‘আ করেন। এছাড়াও আরও বিভিন্ন দু‘আ করে বক্তব্য শেষ করেন।

৬. ছহীহুল জামে‘, হা/৫৯৩৯; মিশকাত, হা/৪৫৯৯।

৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৪; মিশকাত, হা/৫২৯৮।

www.al-itisam.com

নফল ছালাত

-মো. দেলোয়ার হোসেন*

ভূমিকা :

নফল ছালাত আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার একটি বড় মাধ্যম। এর মাধ্যমে হাশরের মাঠের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত আমরা যে ছালাতগুলো পড়ে থাকি, সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

নফল ছালাতের পরিচয় :

نَفْلٌ আরবী শব্দ। একবচন, বহুবচনে نَوَافِلُ অর্থ : অতিরিক্ত, বাড়তি, ঐচ্ছিক ইত্যাদি। ফরয ছালাত ছাড়া অন্য যে ছালাত মানুষ আদায় করে, তাই নফল ছালাত। সুন্নাত, নফল, মানদূব ও মুস্তাহাব এসবই সমার্থক। সবগুলো শব্দই কাছাকাছি একই অর্থ বহন করে।

নফল ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত :

নফল ছালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذلِكَ

‘কিয়ামতের দিন সব জিনিসের পূর্বে বান্দার যে আমলের হিসাব হবে, তা হলো ছালাত। যদি তার ছালাত সঠিক হয়, তাহলে সে সফলকাম হবে ও নাজাত পাবে। আর যদি ছালাত বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরয ছালাতে কিছু ভুল হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে বলবেন, দেখো আমার বান্দার নিকট নফল ছালাত আছে কি-না? তাহলে সেখান থেকে এনে বান্দার ফরয ছালাতের ত্রুটি পূরণ করে দেওয়া হবে। এরপর এ রকম বান্দার অন্যান্য হিসাব নেওয়া হবে’।[১] হাদীছে কুদুসীতে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ .

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমার অলীর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। বান্দা যা কিছু দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে, তার মধ্যে আমার নিকট অধিক প্রিয় হলো সেই ইবাদত, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আর সে নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর আমি তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শ্রবণ করে। তার চোখ হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে দেখে। তার হাত হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে ধরে। তার পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে চলে। সে আমার যা চাই আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আর আমি যে কাজ করি, তাতে কোনো দ্বিধাবোধ করি না- যতটা দ্বিধাবোধ করি একজন **মুমিনের** জীবন সম্পর্কে, কারণ সে মরণকে অপছন্দ করে। আর আমি তার (বেঁচে থেকে) কষ্ট পাওয়াকে অপছন্দ করি’।[২]

রবীআ ইবনু কা‘ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوَ غَيْرَ ذلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ‘আমি রাতের বেলা নবী করীম ﷺ-এর সাথে থাকতাম। ওযূর পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, (দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্য যা কিছু চাও) চেয়ে নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমি শুধু জান্নাতে আপনার সহচর্য লাভ করতে চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই আমার একমাত্র আবেদন। তিনি বললেন, তুমি বেশি বেশি সেজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো’।[৩] অর্থাৎ নফল ছালাতের মাধ্যমে আমার সাহায্য কামনা

---

* আলিম ২য় বর্ষ, চরবাটা ইসমাঈলিয়া আলিম মাদরাসা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

১. আবূ দাঊদ, হা/৮৬৪; তিরমিযী, হা/৪১৩; নাসাঈ, হা/৪৬৬; মিশকাত, হা/১৩৩০।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫০২।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮৯; আবূ দাঊদ, হা/১৩২০, নাসাঈ, হা/১১৩৮; মিশকাত, হা/৮৯৬।

করো। উম্মে হাবীবা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে লোক দিনে-রাতে ১২ রাকআত ছালাত আদায় করবে, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে। তা হলো, চার রাকআত যোহরের পূর্বে আর দুই রাকআত যোহরের পরে, দুই রাকআত মাগরিবের পরে, দুই রাকআত এশারের পরে আর দুই রাকআত ফজরের পূর্বে’।[৪]

নফল ছালাতের নিয়ম :

নফল ছালাত বাড়িতে পড়া সুন্নাত। যায়েদ ইবনু সাবেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَفْضَلُ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ‘ফরয ছালাত ব্যতীত তোমাদের বাড়িতে আদায়কৃত ছালাত সর্বোৎকৃষ্ট’।[৫] ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا‘তোমাদের বাড়িতেও ছালাত আদায় করো, তাকে কবরস্থানে পরিণত করো না’।[৬] জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের কারও মসজিদে ফরয ছালাত শেষ হলে সে যেন কিছু ছালাত বাড়িতে আদায়ের জন্য রেখে দেয়। কেননা আল্লাহ তার এ ছালাতের জন্য বাড়িতে কল্যাণ দান করবেন’।[৭]

সুন্নাত ছালাত আদায় করার সময় স্থান পরিবর্তন করা সুন্নাত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ‘তোমাদের কেউ (ফরয) ছালাত পড়ার পর একটু সামনে এগিয়ে বা পিছনে সরে অথবা তার ডানে বা বামে সরে (নফল) ছালাত আদায় করতে কি অপারগ হবে?’[৮] নফল ছালাত কিছু অংশ দাঁড়িয়ে ও কিছু অংশ বসে পড়া যায়।[৯]

ফজরের সুন্নাত :

ফজরের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ‘নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল ছালাতের মধ্যে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ছালাতের প্রতি যেমন অত্যধিক যত্ন নিতেন আর কোনো ছালাতের উপর এত অত্যধিক যত্ন নিতেন না’।[১০] আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা আরও বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ছালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে অধিক উত্তম’।[১১] তবে তা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, ‘যখন মুআযযিন আযান দিত ও ফজর উদয় হতো, তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত ছালাত পড়তেন’।[১২]

ফজরের সুন্নাত ছালাতে প্রথম রাকআতে সূরা কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাছ পাঠ করা সুন্নাত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ‘নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতে সূরা ‘কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরূন’ ও ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ পাঠ করতেন’।[১৩] নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতে সূরা বাক্বারার ১৩৬ ও সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াত পড়তেন।[১৪] ফজরের সুন্নাত শেষ করে ডান পার্শ্বে শোয়া মুস্তাহাব। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ‘নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়তেন, তখন ডান পার্শ্বে শুয়ে (বিশ্রাম) নিতেন’।[১৫]

যোহরের সুন্নাত :

যোহরের পূর্বে চার রাকআত ছালাত পড়া সুন্নাত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ‘নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত কখনো

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৮; তিরমিযী, হা/৪১৫; নাসাঈ, হা/১৮০৬; ইবনু মাজাহ, হা/১১৪১; মিশকাত, হা/১১৫৯ ‘সুন্নাত ছালাতসমূহ ও এর ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-৩০।
৫. তিরমিযী, হা/৪৫০, ‘বাড়িতে নফল ছালাত আদায়ের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-২১৯; আবূ দাঊদ, হা/১০৪৪।
৬. তিরমিযী, হা/৪৫১, ‘বাড়িতে নফল ছালাত আদায়ের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-২১৯।
৭. ছহীহ তারগীব, হা/৪৩৩।
৮. ইবনু মাজাহ, হা/১৪২৭, ‘ফরয ছালাত আদায়ের স্থানে নফল ছালাত আদায় প্রসঙ্গে’ অনুচ্ছেদ; আবূ দাঊদ, হা/১০০৬।
৯. ফিক্বহুস সুন্নাহ, (শতাব্দী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : ২০১০ খ্রি.), ১/১৬৫।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৪; মিশকাত, হা/১১৬৩, ‘সুন্নাত ছালাতসমূহ ও এর ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-৩০।
১১. ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৫; মিশকাত, হা/১১৬৪, ‘সুন্নাত ছালাতসমূহ ও এর ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-৩০।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭০৯।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১৭২৩।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৭২৪-১৭২৫।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/১১৬০, ‘ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের পর ডান কাতে শোয়া’ অনুচ্ছেদ-২৩।

www.al-itisam.com

ত্যাগ করতেন না'।[১৬] আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, 'নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূর্য হেলে যাওয়ার পর যোহরের ছালাতের পূর্বে চার রাকআত ছালাত আদায় করতেন। তিনি বলতেন, এটা এমন এক সময় যখন (নেক আমল উপরের দিকে যাওয়ার জন্যে) আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। তাই এ মুহূর্তে আমার নেক আমলগুলো উপরের দিকে চলে যাক এটা আমি চাই'।[১৭] আবূ ছালেহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যোহরের ছালাতের পূর্বে চার রাকআত ছালাত তাহাজ্জুদের ছালাতের মতো ফযীলতপূর্ণ'।[১৮] অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি চাশতের চার রাকআত ছালাত ও যোহরের পূর্বে চার রাকআত ছালাত পড়বে, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে'।[১৯]

যোহরের পূর্বে দুই রাকআত ছালাতও পড়া যায়। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ 'আমি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যোহরের ফরযের পূর্বে ও পরে দুই রাকআত ও মাগরিবের ফরযের পরে দুই রাকআত ছালাত তাঁর বাড়িতে এবং এশার ফরযের পর দুই রাকআত তাঁর বাড়িতে আদায় করেছি। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) আরও বলেছেন, হাফছা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) আমার নিকট বলেছেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হালকা করে দুই রাকআত ছালাত ফজরের ছালাতের সময় আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আদায় করতেন'।[২০]

যোহরের পরে চার রাকআত ছালাতও পড়া যায়। উম্মু হাবীবা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, আমি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ 'যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে ও পরে চার রাকআত ছালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান হয়, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন'।[২১]

আছরের সুন্নাত :

আছরের পূর্বে চার রাকআত ছালাত পড়া সুন্নাত। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, رَحِمَ اللهُ امْرَءًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا 'আল্লাহ তাআলা ঐ লোকের উপর রহমত বর্ষণ করেন, যে লোক আছরের পূর্বে চার রাকআত ছালাত আদায় করে'।[২২]

মাগরিবের সুন্নাত :

মাগরিবের পূর্বে ও পরে দুই রাকআত ছালাত পড়া সুন্নাত। আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ 'মাগরিবের পূর্বে তোমরা দুই রাকআত ছালাত আদায় করো। মাগরিবের পূর্বে তোমরা দুই রাকআত ছালাত আদায় করো। তৃতীয়বার তিনি বলেছেন, যিনি ইচ্ছা করেন (তিনি পড়বেন)'।[২৩] আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, 'আমরা মদীনায় ছিলাম। (এ সময়ে অবস্থা এমন ছিল যে, মুআযযিন মাগরিবের আযান দিলে (কোনো কোনো ছাহাবী) মসজিদের খুঁটির দিকে দৌড়াতেন আর দুই রাকআত ছালাত আদায় করতে আরম্ভ করতেন। এমনকি কোনো মুসাফির লোক মসজিদে এসে অনেক লোককে একা একা ছালাত আদায় করতে দেখে মনে করতেন, (ফরয) ছালাত সমাপ্ত হয়ে গেছে। অথচ লোকেরা এখন সুন্নাত পড়ছে'।[২৪]

মারছাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, أَتَيْتُ عُقْبَةَ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ أَلَا أُعَجِّبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ؟ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ 'আমি একবার উক্ববা ইবনু আমির আল-জুহানী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি কি আপনাকে আবূ তামীম আদ-দারীর (তাবেঈ) একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনাবো না? তিনি মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দুই রাকআত ছালাত আদায় করেন। তখন উক্ববা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, এ ছালাত তো আমরা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যামানায় আদায় করতাম। তখন তিনি বললেন, তাহলে এ ছালাত এখন আদায় করতে আপনাকে কী বাধা দিচ্ছে? উত্তরে

১৬. ছহীহ বুখারী, হা/১১৮২।
১৭. তিরমিযী, হা/৪৭৮, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/১১৬৯, 'সুন্নাত ছালাতসমূহ ও এর ফযীলত' অনুচ্ছেদ-৩০।
১৮. সিলসিলা ছহীহা, হা/১৪৩১।
১৯. সিলসিলা ছহীহা, হা/২৩৪৯।
২০. ছহীহ বুখারী, হা/১১৮১, 'যোহরের পূর্বে দুই রাকআত ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৯; মিশকাত, হা/১১৬০।
২১. আবূ দাঊদ, হা/১২৬৯, 'যোহরের পূর্বে ও পরে চার রাকআত ছালাত প্রসঙ্গে' অনুচ্ছেদ-২৯৬; তিরমিযী, হা/৪২৮; নাসাঈ, হা/১৮১৬; ইবনু মাজাহ, হা/১১৬০, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/১১৬৭।
২২. আবূ দাঊদ, হা/১২৭১; তিরমিযী, হা/৪৩০, 'আছরের পূর্বে চার রাকআত' অনুচ্ছেদ-২০৬; মিশকাত, হা/১১৭০।
২৩. ছহীহ বুখারী, হা/১১৮৩, 'মাগরিবের পূর্বে ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩৫; আবূ দাঊদ, হা/১২৮১; মিশকাত, হা/১১৬৫।
২৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৩৭; মিশকাত, হা/১১৮০।

তিনি বললেন, (দুনিয়ার) কর্মব্যস্ততা'।[২৫] উল্লেখ্য, মাগরিবের পরে চার, ছয় বা বিশ রাকআত ছালাত পড়ার মর্মে হাদীছগুলো দুর্বল।[২৬]

এশার সুন্নাত :

এশার পরে দুই রাকআত ছালাত পড়া সুন্নাত। যেমনটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে এবং বিতরের ছালাত পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব রহিমাহুল্লাহ বলেন,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِه فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِيْ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِيْ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيْلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّى رَكْعَتَيْنِ.

'আমি নবী ﷺ-এর নফল ছালাতের ব্যাপারে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে প্রশ্ন করেছি। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেছেন, নবী ﷺ প্রথমে আমার ঘরে যোহরের পূর্বে চার রাকআত ছালাত আদায় করতেন। তারপর মসজিদে যেতেন। সেখানে লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি কক্ষে ফিরে আসতেন এবং দুই রাকআত ছালাত আদায় করতেন। (ঠিক এভাবে) তিনি লোকদেরকে নিয়ে মাগরিবের ছালাত মসজিদে আদায় করতেন। তারপরে ঘরে ফিরে এসে দুই রাকআত ছালাত আদায় করতেন। রাতে তিনি (তাহাজ্জুদের) ছালাত কখনো ৯ রাকআত পড়তেন। এর মাঝে বিতরের ছালাতও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর রাতে তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ও দীর্ঘ সময় বসে বসে ছালাত আদায় করতেন, যে সময় তিনি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতেন, দাঁড়ানো থেকেই রুকূ-সেজদায় চলে যেতেন। আর যখন বসে বসে ছালাত আদায় করতেন, বসা থেকেই রুকূ-সেজদায় চলে যেতেন। ছুবহে ছাদিকের সময় ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করে নিতেন'।[২৭]

জুমআর সুন্নাত :

জুমআর ফরয ছালাতের পূর্বে নির্দিষ্ট কোনো সুন্নাত ছালাত নেই। ইমামের খুৎবার পূর্বে দুই দুই বা চার রাকআত করে ছালাত পড়া যায়। সালমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ﷺ বলেছেন,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

'যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করবে, যতটুকু সম্ভব পবিত্রতা অর্জন করবে, তারপর নিজের তেল হতে তার শরীরে কিছু তেল মাখাবে, অথবা ঘরে সুগন্ধি থাকলে কিছু সুগন্ধি লাগাবে। তারপর মসজিদের দিকে রওনা হবে। দুই ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করবে না। যতটুকু সম্ভব ছালাত আদায় করবে। চুপচাপ বসে ইমামের খুৎবা শুনবে। তাহলে এই জুমআ ও পূর্বের জুমআর মাঝখানে তার সব (ছগীরা) গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে'।[28]

জুমআর ফরয ছালাতের পরে মসজিদে চার রাকআত ছালাত পড়া সুন্নাত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের যে লোক জুমআর (ফরয ছালাতের) পর ছালাত আদায় করতে চায়, সে যেন চার রাকআত ছালাত আদায় করে নেয়'।[২৯]

আর বাড়িতে পড়লে দুই রাকআত পড়া সুন্নাত। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ 'নবী করীম ﷺ জুমআর ছালাতের পর বাসায় পৌঁছার পূর্বে কোনো ছালাত আদায় করতেন না। বাসায় পৌঁছার পর তিনি দুই রাকআত ছালাত আদায় করতেন'।[৩০]

উপসংহার :

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের সাথে সাথে নফল ছালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

২৫. ছহীহ বুখারী, হা/১১৮৪, 'মাগরিবের পূর্বে ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩৫; মিশকাত, হা/১১৮১।

২৬. জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছালাত (আছ-ছিরাত প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ৩১৬-৩২০।

২৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৩০; আবূ দাঊদ; হা/১২৫১; মিশকাত, হা/১১৬২।

২৮. ছহীহ বুখারী, হা/৮৮৩; মিশকাত, হা/১৩৮১।

২৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮১, 'জুমআর পর সুন্নাত ছালাত সম্পর্কে' অনুচ্ছেদ-১৮; মিশকাত, হা/১১৬৬।

৩০. ছহীহ বুখারী, হা/৯৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮২, 'জুমআর পর সুন্নাত ছালাত সম্পর্কে' অনুচ্ছেদ-১৮; মিশকাত, হা/১১৬১।

একের পর এক আলেমের উপর হামলা : কোন দিকে যাচ্ছে পরিস্থিতি?

-জুয়েল রানা*

আলাপন : আলেমদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ইসলাম। ইসলামের ভালোবাসা তাঁদের হৃদয়ের গভীরে প্রথিত। তাঁরা ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী। তাঁরা হলেন দ্বীন রক্ষার ঢাল ও সুদৃঢ় প্রাচীর। ইসলামের বিরুদ্ধে যেকোন ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় তাঁরা সদা প্রস্তুত থাকেন। যেকোন বাতিল মতবাদকে প্রতিহত করতে তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। হক্ব কথা বলতে গিয়ে যেকোন হুমকি বা আশঙ্কার সম্মুখীন হতে তারা মোটেও পিছপা হন না। হক্ব প্রতিষ্ঠায় জান-মাল ব্যয় করতে পারাকে তাঁরা গৌরবের বিষয় মনে করেন। বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করতে তাঁরা মোটেও কালক্ষেপণ করেন না। বিদআতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে সুন্নাত তাঁদের হাতেই হয়ে ওঠে জীবন্ত। যেকোনো শারঈ সমস্যা সমাধানে তাঁদের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'যদি তোমরা না জেনে থাকো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো *(আন-নাহল, ১৬/৪৩)*। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নক্ষত্ররাজির উপর পূর্ণিমার চাঁদের যেমন প্রাধান্য, ঠিক তেমনি (মূর্খ) আবেদগণের উপর আলেমগণের প্রাধান্য। তাঁরা নবীগণের উত্তরাধিকারী'[1] হওয়ায় তাঁদের বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যুগে যুগে প্রত্যেক হক্বপন্থী আলেমকে নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। হতে হয়েছে বিপদ ও সমস্যার মুখোমুখী। সম্প্রতি একের পর এক তাঁদের উপর হামলা সেই বাস্তবতাকেই যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের উপর হামলা : গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ রোজ রবিবার দুপুরে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের মল্লিকপুরে ইসলামবাজার আল-ফুরকান মসজিদে যোহরের ছালাত আদায় করে সিলেটে ফেরার পথে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ হামলার শিকার হন। স্থানীয় সূত্র হতে জানা যায়, রবিবার বাদ যোহর মল্লিকপুর গ্রামের আল-ফুরকান মসজিদের পরিচালনা কমিটি একটি দ্বীনী আলোচনার আয়োজন করে। আল-জামি'আহ্ আস-সালাফিয়্যাহ্, রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জের পরিচালক শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ উক্ত সভার আলোচক হিসেবে আমন্ত্রিত হন। তিনি মসজিদে যোহরের ছালাত শেষে গাড়িতে করে মধ্যাহ্নভোজের দাওয়াতে স্থানীয় একজন দ্বীনী ভাইয়ের বাসায় যাওয়ার পথে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক হামলার শিকার হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায়, শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের গাড়ি রাস্তায় আসা মাত্রই ১০-১২ জন যুবক ইট-পাটকেল ও লাঠি-সোঁটা দিয়ে তাঁর গাড়ীতে হামলা চালায়। ফলে তাঁর গাড়ির প্রায় সব গ্লাস ভেঙে যায়। গাড়ির বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আক্রমণকারীদের হামলায় শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, আয়োজক আতিকুর রহমান মিঠু ও তাঁর সফরসঙ্গী হুমায়ুন কবীর রিপনসহ আরো দুইজন আহত হন।[2] গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ রাত নয়টায় জনপ্রিয় ইউটিউব চ্যানেল 'Face The People'-এর লাইভ টকশোতে সেই দিনের ভয়াবহ ও অতর্কিত হামলার বিবরণ শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ নিজেই তুলে ধরেন এবং তাঁর উপর আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের দাঁত ভাঙা জবাব দেন। উল্লেখ্য, শায়খের উপর ঐ হামলার ঘটনায় দল-মত নির্বিশেষে সারা দেশে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠে। সেই সাথে আল-জামি'আহ্ আস-সালাফিয়্যাহ্, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে শিক্ষকগণ অগ্নিঝরা প্রতিবাদী বক্তব্য পেশ করেন।

মাওলানা হাসিবুর রহমানের গাড়ি ভাঙচুর : গত ০৭-০২-২০২১ খ্রিষ্টাব্দ, রবিবার কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার গোবিন্দ্রপুর ইউনিয়নের নারায়ণপুর গ্রামে ইসলামিক মাহফিল চলাকালীন সময়ে স্থানীয় গুণ্ডাবাহিনী চলমান ঐ দ্বীনী মাহফিলে বাধা দেয় এবং মাওলানা হাসিবুর রহমানসহ আরো অনেকের গাড়ি ভাঙচুর করে। পরবর্তীতে জনাব মাওলানা হাসিবুর রহমান লাকসাম থানায় যোগাযোগ করলে লাকসাম থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।[3]

---

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; সহকারী শিক্ষক, চম্পাতলী জান্দি পাড়া ইসলামিক একাডেমি, চম্পাতলী বাজার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

১. সুনানে তিরমিযী, হা/২৬৮২।

২. https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/15/1005169.

৩. দেশ সময়, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ (অনলাইন সংস্করণ)।

মাওলানা নূহ বিন হুসাইনের উপর হামলা : গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সিলেট থেকে ফেরার পথে একদল সন্ত্রাসী মৌলভীবাজারের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা নূহ বিন হুসাইনের উপর হামলা করে এবং তার মোবাইল ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায়।[4]

হাফেয ওমর ফারুকের উপর নির্যাতন : চাঁদপুরের কচুয়ার সাতবাড়িয়ায় এক মাদরাসা শিক্ষকের বিরুদ্ধে একই মাদরাসার হিফয বিভাগের ১৩ বছরের ছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগ আনা হয়। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর উপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায় ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট ছিল। উক্ত মাদরাসার সিসিটিভি ফুটেজ থেকে পরিস্কার হয়ে যায় যে, অভিযুক্ত উক্ত শিক্ষক সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন। মাদরাসা কর্তৃপক্ষের সাথে শত্রুতার জের ধরে মাদরাসা বন্ধের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ঐ শিক্ষককে ফাঁসানো হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। মাদরাসার সেই শিক্ষকের নাম হাফেয ওমর ফারুক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ঐ মাদরাসায় শিক্ষকতা করে আসছেন। নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত সেই শিক্ষক নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর মাদরাসা কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন অভিযোগ তোলা শিক্ষার্থীর বাবা। ক্ষমা চাওয়ার সময় ছেলেটির বাবা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য কেঁদে ফেলেন। নির্যাতনের শিকার শিক্ষকের বিরুদ্ধে শুরুতে তিনি মামলা করতে রাজি ছিলেন না বলে জানান।[5]

গত ১ জানুয়ারি, ২০২১ সন্ধ্যায় কচুয়া জামিয়া আহমাদিয়ার মুহতামিম মাওলানা আবু হানিফার নেতৃত্বে মাদরাসার এক মিটিং-এ সাংবাদিক, আইনজীবীদের সামনে সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হয়। যেখানে ষড়যন্ত্রের শিকার সেই শিক্ষক নির্দোষ প্রমাণিত হন। চাঁদপুরের কচুয়ার সাতবাড়িয়ায় তা'লীমুল কোরআন মাদরাসার শিক্ষক হাফেয ওমর ফারুকের বিরুদ্ধে ১৩ বছরের ছাত্রকে বলাৎকারের মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁর মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়। পুলিশ অভিযুক্ত সেই শিক্ষক ওমর ফারুককে (২২) গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠিয়েছিল। একজন আলেমের প্রতি নির্যাতনের এমন ভিডিও (সামাজিক যোগাযোগে ভাইরাল হওয়া) দেখে আমি নিজেই কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। মিথ্যা বলাৎকারের অভিযোগে তাঁকে যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছে, তা ভয়াবহ। দুই মাস পর জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে জনপ্রিয় ইউটিউব চ্যানেল 'Face The People'-এ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ রাত সাড়ে আটটায় হাফেজ ওমর ফারুক সেই দিনের ভয়াবহ হামলা ও নির্যাতনের বর্ণনা দেন। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বার বার কেঁদে ফেলেন। তাঁর ঐ কান্না দেখে আমরাও কান্না ধরে রাখতে পারিনি। আপনারা যারা ঐ লাইভ টকশোটি দেখেছেন, আপনারা নিশ্চয়ই কেঁদেছেন।

আমরা কচুয়ার ওই ঘটনার বিচার দাবি করছি। একজন অসহায় আলেমের পাশে, একজন নির্যাতিত নায়েবে নবীর ইজ্জত রক্ষায় তাঁর পাশে দাঁড়ানো প্রত্যেক মুসলিমেরই উচিত। কোনরূপ ধামাচাপা, আপস নয়, যারা এই আলেমের গায়ে হাত তুলেছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে তাদের বিচার দাবি করছি। দেখা যাক পরিস্থিতি কোন দিকে যায়?

হেযবুত তাওহীদের হাতে দু'জন আলেম আহত : গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ গাংনী মেহেরপুরে থানায় হেযবুত তাওহীদের কুফরী কর্মকাণ্ড বন্ধ করার দাবিতে কর্মসূচী পালন করা হয়। কর্মসূচী থেকে বাসায় ফেরার পথে মাওলানা হুমায়ুন কবীর ও তাঁর সহযোগীরা ১০/১৫ জন মটরসাইকেল আরোহী কর্তৃক অবরোধের শিকার হন। তারা এসেই মাওলানা ও তাঁর সহযোগীদের মটরসাইকেলের চাবি নিয়ে নেয় এবং এলোপাতাড়ি চড়-থাপ্পড় মারা শুরু করে। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং হেলমেট খুলে নিয়ে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করে।[6] উল্লেখ্য, বর্তমান সময়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ঈমান বিধ্বংসী নব্য ফিতনা হলো 'হেযবুত তাওহীদ'। ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী 'হেযবুত তাওহীদ' বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ভয়ংকর ঈমান নষ্টকারী ফিতনা।[7]

নিরীহ আলেম-উলামার উপর কাদিয়ানীদের হামলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিরীহ আলেম-উলামা ও মাদরাসা ছাত্রদের উপর কাদিয়ানী অনুসারীরা নির্মমভাবে হামলা করে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খতমে নবুওয়াত মাদরাসা দখল করার চেষ্টা

৪. ফেসবুক পেজ : কওমী সংবাদ qawminews, 17 February at 11:12 (Public).

৫. https://publicvoice24.com/2021/01/02/allegations-of-rape-and-torture-of-a-teacher-for-closing-a-madrasa-in-chandpur.

৬. টাইম লাইন : https://m.facebook.com/muftishamsuddohaasrafi.

৭. হেযবুত তাওহীদ (পরিচয়। ভ্রান্ত মতবাদ। অপনোদন), ঢাকা : ফজর পাবলিকেশন্স, প্রথম বাংলা সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ১০।

চালায়। ৯০ ভাগ মুসলিমের দেশে কাদিয়ানীরা এ সাহস পায় কোত্থেকে? কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মানুষরা মুসলিমদের সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্ক রাখতেও চায় না।[৪] অথচ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকের মুখে মদীনার সনদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার কথা শোনা যায়। সেই দেশে, সেই মদীনার নবী, শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে অস্বীকারকারী কাদিয়ানীরা নিরীহ আলেম-উলামার উপর হামলা করার মতো দুঃসাহস দেখায় কীভাবে! আমরা মনে করি, এখনই এদের সমূলে নির্মূল করার সময়। পণ্য বর্জন করে তাদের কোণঠাসা করার সময়।

কিছু কথা, কিছু ব্যথা : ইসলামে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু দলভেদ থাকতে পারে না। বস্তুত আমাদের একটিই দল আছে, তার নাম 'ইসলাম'। সকল মুসলিম আল্লাহর দল এবং সকল কাফের শয়তানের দল। শয়তানের দলকে মুমিন অন্য দল বলে মনে করেন। কোনো মুসলিমকে অন্য মুসলিম অন্য দল বলে মনে করতে পারেন না। পদ্ধতিগত বা মতামতগত পার্থক্যের কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দলাদলি ও বিভক্তি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বেদনা ও কষ্টের।[৯]

আলেম-উলামার উপর হামলা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। যে উলামায়ে কেরাম এ দেশের মানুষের মাঝে নীতি-আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, মানুষকে মনুষ্যত্বের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, সেই ওলামায়ে কেরামের জীবন যদি এভাবে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে, হুমকির মধ্যে পড়ে, তাহলে সেটি আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর এবং দুর্ভাগ্যজনক। আমরা মনে করি, এই বিষয়ে বিভিন্ন মহলের দায়িত্ব আছে। বিশেষ করে উলামায়ে কেরাম যারা আছেন, তাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা উচিত। কেন তাদের উপর হামলা হচ্ছে? আমরা কি অসহিষ্ণুতায় পড়েছি? আমাদের অভ্যন্তরীণ যে চিন্তাধারার মতপার্থক্য আছে, সেগুলোর চর্চা করতে গিয়ে আমরা কি সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছি? একে অপরকে সহ্য করার যে মানসিকতা থাকার কথা, আমরা কী সে মানসিকতা হারাতে বসেছি? এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের সিরিয়াসলি ভাবা উচিত। তা না হলে যদি এভাবে চলতেই থাকে, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ করে এদেশে যারা সেক্যুলার ও নাস্তিক্যবাদি শক্তি আছে, তারা এগুলো দেখে মজা নিবে। আমাদের মধ্যে যেন আরো বেশি হানাহানি হয়, আমরা যেন আরো বেশি বিপদে পড়ি, সেগুলো তারা চাইবে। একটা সময় ছিল এ দেশের প্রায় সবাই (নামধারী ও লেবাসধারী আলেম) ডা. যাকির নায়েকের বিরুদ্ধে মাহফিল গরম করেছিল। পিস টিভির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল? তারা হয়তো ভেবেছিল পিস টিভি বন্ধ হলে আমরা দিব্যি সারা দেশে দ্বীন প্রচার করতে পারব। কিন্তু হচ্ছেটা কী? আসলে চরম বাস্তবতা হলো, উপরে থুথু ফেললে তা উল্টো নিজের উপরই পড়বে। হায়রে মুসলিম জাতি! হুঁশ কবে ফিরবে? ঘুম কবে ভাঙবে?

দেশের ওলামায়ে কেরামকে মাহফিলের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন প্রান্তে যেতে হয়। তাদের নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিয়ে সিনিয়র ওলামায়ে কেরাম যারা আছেন, তাদের ভাবতে হবে- কেন নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে? সেই সাথে সেগুলোর কারণ চিহ্নিত করে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। আর যাঁরা যাচ্ছেন, তারাও দাওয়াত পেলেই যেন না যান। বরং যেখানে যাচ্ছেন, সেই জায়গার পরিবেশ-পরিস্থিতি সবকিছু দেখে-শুনে-বুঝে তারপর দাওয়াত কনফার্ম করবেন এবং যারা দাওয়াত দিচ্ছেন, তাদের কতটুকু যোগ্যতা আছে আলেমদের নিরাপত্তা দেওয়ার সে বিষয়টিও ভেবে দেখবেন। আলেমের সহযোগী যারা আছেন, বিষয়টি তাদেরই খতিয়ে দেখার দায়িত্ব বেশি। কোনো আলেমকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া মোটেই ঠিক না। আয়োজকদেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। যাকে তাকে যেকোনো জায়গায় দাওয়াত দেওয়া উচিত না। যে আলেমকে যেখানে নিরাপত্তা দিতে পারবে না বা তাঁর দায়-দায়িত্ব নিতে পারবে না, অন্তত তাকে নিরাপদে ফেরত দেওয়ার মতো যতটুকু আয়োজন করা দরকার, ততটুকুতো করা উচিত। ওলামায়ে কেরামকে ডেকে এনে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে না। আর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব রয়েছে প্রশাসনের। কারণ, তাদের গাফলতির কারণে যদি ওলামায়ে কেরামের জীবন হুমকির মধ্যে পড়ে, তাহলে সেটা আমাদের কারো জন্যই কল্যাণকর হবে না। আমরা ওলামায়ে কেরামের সকলের নিরাপত্তা কামনা করি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে নিরাপদে ও হেফাযতে রাখুন- আমীন!

---

৮. কে এই কাদিয়ানী, (ঢাকা : আশরাফী বুক ডিপো, তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৬), পৃ. ৭৭।

৯. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ, আল্লাহর পথে দাওয়াত (ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৭), পৃ. ৬৩।

রামাযান মাস, বন্দী শয়তান, তবুও আমরা খারাপ কাজ করি কেন?

*-জাবির হোসেন**

আজ থেকে শুরু পবিত্র রামাযান মাস। সন্ধ্যাবেলা পশ্চিমাকাশে চাঁদ দেখা গেছে। সময় এগিয়ে চলেছে দ্রুত। দেখতে দেখতে এক বছর পেরিয়ে আবার রামাযান মাস এসে উপস্থিত। আল-হামদুলিল্লাহ! মুসলিমদের কাছে রামাযান মাসের গুরুত্বই আলাদা। এই মাস বহু মাহাত্ম্যপূর্ণ মাস— রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাস। এই মাস ত্যাগের মাস, আত্ম-সংযমের মাস, ক্ষুধিতের ক্ষুধা উপলব্ধির মাস।

এই মাসেই নাযিল হয়েছে পবিত্র কুরআন। যে পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ। ভেবে আনন্দিত হচ্ছি যে, আবার আরো একবার অত্যাধিক ছওয়াব সম্বলিত একগুচ্ছ ইবাদতে শামিল হয়ে প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনে প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ! সাহারী, ইফতার, তারাবীহ, ই'তিকাফ, যাকাতুল ফিতর ও ঈদের ছালাতসহ আরো কত ইবাদত।

স্থানীয় একটি মসজিদ থেকে এশা ও তারাবীর ছালাত আদায় করে ঘরে ফিরলাম।

মসজিদে এখন মুছল্লীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। আজ পর্যন্ত মাগরিবের ছালাতে এক কাতারও মুছল্লী ছিল না; কিন্তু এশা ও তারাবীর সালাতে প্রায় তিনগুণ বেশি। —মাশাআল্লাহ! তবে এই গতি মন্থর হতে হতে আবার একই জায়গাতে চলে আসবে। ঠিক যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখানে। হয়তোবা দুয়েকজন নতুন যুক্ত হতে পারে। বিগত কুড়ি বছরে এর ব্যতিক্রম আমার দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয়নি।

আজ মেসে রান্না হয়নি। রাতের খাবার হোটেল থেকে নিয়ে এসেছি। সাহারীর জন্য এখনই খাবার কিনে নিয়েছি।

আমরা একসঙ্গে মোট পাঁচজন খেতে বসেছি আমাদের ঘরেই। আমি, আহমাদ ছাড়াও সঙ্গে আছে পাশের ঘরের ফাহিম, সাইফুল ও শফীকুল। খেতে খেতে সাইফুল আহমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আহমাদ! প্রতিবছর তো মুসলিমরা ছিয়াম পালন করছে, কিন্তু মুসলিম সমাজের পরিবর্তন আমার চোখে পড়ছে না কেন? রামাযান মাস চলে যেতে না যেতেই আবার সেই মদ, জুয়া, ঘুস, হিংসা-বিদ্বেষ, গান-বাজনা, যৌতুক, আত্মসাৎ, দাম্পত্য-কলহসহ আরও কত শত পাপ কর্মে লিপ্ত'।

সাইফুলের কথা শেষ হতে না হতেই শফীকুল বলল, 'আরে বাবা! রামাযানের পরের কথা ছাড়, এই মাসেও কি এই কাজগুলো ছেড়েছে? —এই মাসে নাকি শয়তান শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে, তারপরও কেন মানুষ খারাপ কাজ করে?'

ফাহিম শফীকুলকে সমর্থন জানিয়ে বলল, 'আমার তো মনের মধ্যে অনেক দিন থেকে এই প্রশ্নটি ঘুরপাক খাচ্ছিল। সত্যিই তো, খারাপ কাজের জন্য যে দায়ী, সেই শয়তানকে মহান আল্লাহ বন্দী করে রেখেছেন; তাহলে খারাপ কাজ ঘটবে কেন? —যে উনুনে আগুন নাই, সেখানে কি রান্না হয়? আর যেখানে আগুনই নেই, সেখানে ধোঁয়া আসবে আবার কোথা থেকে?'

আমিও মনে মনে ভাবলাম, যাক আমারও অনেক দিনের সংশয় আজ ক্লিয়ার হতে পারে ইনশাআল্লাহ।

আমি আহমাদের দিকে তাকালাম। আহমাদের চোখে আমার চোখ পড়ল। আহমাদ এক পলক সকলের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'তাহলে এখন এই বিষয়ের উপরই আলোচনা হয়ে যাক— তাই তো!'

আমরা সকলে এক বাক্যে সায় দিলাম।

আহমাদ বলতে শুরু করল, 'এটি একটি কমন প্রশ্ন। যখন আলোচনা করা হয় যে, রামাযান মাসে শয়তানকে বন্দী করা হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে এই একই প্রশ্নই চলে আসে। যদি সত্যিই শয়তান বন্দী থাকে, তাহলে কীভাবে মানুষ পাপ কাজ করতে পারে?

এ ব্যাপারে একটি হাদীছ আছে।— এক সেকেন্ড! আমি হাদীছটি দেখাচ্ছি'।

এই বলে আহমাদ তার পকেট থেকে স্মার্ট ফোনটি বের করল।

* এম. এ. (অধ্যয়নরত), বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

তারপর 'বাংলা হাদিস' অ্যাপস থেকে একখানা হাদীছ বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, জোরে জোরে পড়ে সকলকে শোনা।

আমি মোবাইলটি হাতে নিয়ে স্ক্রিনে থাকা হাদীছটি সশব্দে পড়তে লাগলাম। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রামাযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর শয়তানকে শিকল বন্দী করে দেওয়া হয়'।[১]

ফোনটি আমার হাত থেকে নিয়ে আহমাদ বলল, 'এই বিষয়টি পরিষ্কার করতে হলে, প্রথমে দুটি বিষয় জানতে হবে। প্রথমত, শয়তানের পরিচয় ও তার কাজ সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়ত, মানুষ পাপ কাজ করে কেন?'।

আহমাদের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, মানুষ আবার কেন পাপ কাজ করে, কারণ শয়তান তাকে পাপ কাজ করায় তাই— এই আর কী।

আমার কথা শুনে আহমাদ বলল, 'এই ধারণার জন্যই তো আমাদের মনে আলোচ্য প্রশ্নটি উত্থিত হয়— বন্ধু! কিন্তু জেনে রাখা ভালো, কুরআন ও হাদীছের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের পাপের জন্য শয়তান এককভাবে দায়ী নয়'।

আমি বললাম, 'আমরা তো ছোটবেলা থেকেই একথা জেনে এসেছি। —ঠিক আছে, তাহলে তুই বল মানুষ কী কারণে পাপ করে?'

'ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ পাপ করে, কারণ— প্রথমত, শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দেয় এবং তার কুমন্ত্রণায় সাড়া দিয়ে অনেকে গুনাহ করে। দ্বিতীয়ত, মানুষ তার কু-প্রবৃত্তির কারণে পাপ করে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম; কিন্তু আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; তোমাদের উপর তো আমার কোনো আধিপত্য ছিল না, তবে এতটুকু যে, আমি তোমাদের আহ্বান করেছিলাম, আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে; সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতিই দোষারোপ করো' *(ইবরাহীম, ১৪/২২)*।

এই আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শয়তান মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পাপ করায়। শয়তান আমাদের মাঝে এসে কুমন্ত্রণা দেয়, আর আমরা শয়তানের কুমন্ত্রণায় সাড়া দিয়ে পাপ কাজ সংঘটিত করি'। —আহমাদ বলল।

ফাহিম বলল, 'শয়তানের কুমন্ত্রণাতে আমরা খারাপ কাজ করি বটে, তবে শয়তানের পরিচয় কী?'

আহমাদ হাতের ইশারা করে বলল, 'ওয়েট, মাই ফ্রেন্ড! এবার তো আমি শয়তানের পরিচয় সম্পর্কে বলব।

আরবী ভাষায় 'শয়তান' অবাধ্য বা বিদ্রোহীকে বলা হয়। যেহেতু সে নিজ প্রতিপালকের প্রতি অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ প্রদর্শন করেছে, তাই তাকে শয়তান বলা হয়।[২]

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, 'আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য বহু শয়তানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি, তাদের কতক শয়তান মানুষের মধ্যে এবং কতক শয়তান জিনদের মধ্য হতে হয়ে থাকে' *(আল-আন'আম, ৬/১১২)*।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাছীরে উল্লেখ আছে, ক্বাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'জিনদের মধ্যেও শয়তান আছে এবং মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে'।[৩]

আমি বললাম, 'তাহলে তুই বলতে চাচ্ছিস যে, শয়তান দুই প্রকার। মানব শয়তান ও জিন শয়তান'।

'একজ্যাক্টলি, কুরআন তো তাই বলছে। এরই সমর্থনে একটি সূরা আছে'। —আহমাদ বলল।

'কোন সূরা?' —শফীকুল বলল।

'সূরা আন-নাস। পবিত্র কুরআনের ১১৪ নম্বর সূরা। যেখানে উল্লেখ আছে, 'বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির ও মানুষের মা'বূদের। আত্মগোপনকারী

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৯।

২. আব্দুল হামীদ মাদানী, জ্বিন ও শয়তান জগৎ (তাওহীদ প্রকাশনী-বর্ধমান), পৃ. ৯।

৩. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, তাফসীর ইবনে কাছীর (অনুবাদ), পৃ. ১৬৬।

www.al-itisam.com

কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। জিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে'।

তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে, এই সূরাতে— কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা কীভাবে শয়তান থেকে রক্ষা পাব বা হেফাযত চাইব। শেষ দুই আয়াতে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান— মানুষ ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে'।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মানুষ কি শুধু শয়তানের কুমন্ত্রণাতে পড়ে গুনাহ করে'।

'না'।

'তাহলে?'

'পবিত্র কুরআন বলছে, 'তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্য বানিয়েছে?' *(আল-জাছিয়া, ৪৫/২৩)*। এই আয়াত স্পষ্ট করছে যে, মানুষ নিজ কুপ্রবৃত্তির দ্বারাও অন্যায় করে। এজন্যই প্রিয় নবী ﷺ এই বলে দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি মন্দ স্বভাব, আমল ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে'।[৪]

পাপ কেবল শয়তানই ঘটায় না। বরং মন্দ কাজে আসক্ত মানুষের মনের ভূমিকা এক্ষেত্রে কম নয়। শয়তানের প্রভাব হ্রাস পেলে বা বন্ধ হয়ে গেলেও শয়তানের কুমন্ত্রণা দ্বারা প্রভাবিত মন খুব সহজেই পাপে জড়িয়ে পড়ে। এটি হলো মানুষের 'নাফসে আম্মারা'। যে নাফস বা মন শয়তানের প্রতিনিধি হয়ে পাপকর্ম সংঘটিত করে থাকে'।[৫]

আমি আহমাদকে বললাম, 'নাফসে আম্মারা' কী একটু বুঝিয়ে বল?

আহমাদ একটু কশে বলতে লাগল, নাফসে আম্মারা হলো— কুপ্রবৃত্তি বা মন্দ কাজে বার বার প্ররোচনা দানকারী আত্মা। আমর মানে হুকুম। আম্মারা মানে হুকুমকারী। হুকুমদাতা নাফস সবসময় দাবী জানাতেই থাকে। অবিরাম হুকুম করতে থাকে— এটা চাই, ওটা দাও, এখনই চাই। নাফসের যেহেতু নৈতিক চেতনা নেই, সেহেতু সে মন্দ কাজের হুকুম দিতেই থাকে। যেমন : সূরা ইউসুফের ৫৩ নম্বর আয়াতে আছে, 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম প্রবণ; কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। এককথায়, মন্দ কাজের হুকুম করাই এই নাফসের স্বভাব।[৬]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে। যেমন : সূরা আন-নিসা ১৩৫, সূরা আল-আন'আম ১৫০ ও সূরা ছোয়াদ ২৬ নম্বর আয়াতে'।

সাইফুল আহমাদকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল, 'ফ্রেন্ড, আই হ্যাভ এ কোশ্চেইন?'

—'বল'।

'মানুষ প্রথমত পাপ করে শয়তানের কুমন্ত্রণাতে— রাইট। কিন্তু শয়তানকে কে কুমন্ত্রণা দেয়?'

'গুড কোশ্চেইন'। —আহমাদ বলল।

—এর উত্তর হলো, সে নিজেই আপন কুপ্রবৃত্তির দ্বারা খারাপ কাজ করে। কেউ কাউকে কুমন্ত্রণা দিয়ে কোনো কাজ করাতে বাধ্য করতে পারে না। মানুষ ও জিন উভয়ই মূলত নিজ প্রবৃত্তির দ্বারা খারাপ কাজ করে। যার কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হয়।[৭]

সাইফুল, 'হুমমম'।

আহমাদ পুনরায় বলতে শুরু করল, 'এবার মূল কথায় আসা যাক। শয়তান শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মানুষ কীভাবে খারাপ কাজ করে?

এখানে একটি বিষয় আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, শয়তান যদিও শিকল দিয়ে বাঁধা, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে শয়তান একেবারে ডেড বা শেষ; বরং শয়তান অ্যালাইভ বা জীবিত। তারা মরে যায়নি; তাদের ক্ষমতা রোধ হয়েছে মাত্র। বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে একটি উদাহরণ দিলে :

৪. সুনানে তিরমিযী, হা/৩৫৯১।
৫. আব্দুল হামীদ মাদানী, রমযানের ফাযায়েল ও রোজার মাসায়েল (তাওহীদ প্রকাশনী-বর্ধমান), পৃ. ১৯।
৬. অধ্যাপক গোলাম আযম, নাফস রূহ কালব (কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১০), পৃ. ১৩।
৭. মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান মিনার, আল্লাহ কেন শয়তান সৃষ্টি করলেন? ('ইসলাম বিরোধীদের জবাব' Apps)।

www.al-itisam.com

—আচ্ছা, তোরা কখনও কোনো চিড়িয়াখানা গিয়েছিস?'

আমি বললাম, হ্যাঁ, গত বছর 'কলকাতা আলিপুর জু' গিয়েছিলাম।

শফীকুল ও সাইফুল দুজনেই বলল, 'হ্যাঁ'।

ফাহিম মনমরা হয়ে অপ্রস্তুতভাবে জবাব দিল, 'আমি এখনও চিড়িয়াখানা দেখলাম না'।

সাইফুল বাম হাতে ফাহিমের পিঠে মৃদু আঘাত করে বলল, 'ডোন্ট ওয়ারি! এবার কলকাতা গেলে তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তারপর, আলিপুর জু, বোটানিক্যাল গার্ডেন, নিকো পার্ক, অ্যাকোয়াটিকা, ভিক্টোরিয়াসহ আরো অন্যান্য জায়গা ঘুরিয়ে দেখাব— কেমন?'

আহমাদ বলল, 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলছিলাম এবার সেদিকে আসি—

চিড়িয়াখানায় গিয়ে তোরা নিশ্চয়ই বাঘ দেখেছিস?'

'ইয়েস'। —আমরা মাথা নাড়ালাম।

'চিড়িয়াখানায় তোরা যে বাঘ দেখেছিস, সেটা কিন্তু একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে; যেখান থেকে দেখলে বাঘ তোদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

কর্তৃপক্ষ কিন্তু নিরাপত্তার জন্য বাঘকে বন্দী করে রেখেছে। এখন কেউ যদি নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে, সিকিউরড জায়গা ক্রস করে বাঘের নিকটবর্তী হয়; তাহলে বাঘ তাকে আক্রমণ করবে— এটি স্বাভাবিক ঘটনা। উপরন্তু, তাকে হত্যাও করতে পারে।

অর্থাৎ বাঘ একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বন্দী আছে। আমরা এক নিরাপদ জায়গা থেকে সেটি দেখছি; ফলে সে আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারছে না। তবে আমাদের এই নিরাপত্তা নির্ভর করছে, বাঘ হতে কত দূরে আমরা অবস্থান করছি। একইভাবে, রামাযান মাসে শয়তান শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। আমরা যদি নিজে শয়তান থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকি, তবে শয়তান আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। মনে রাখতে হবে, শয়তান এখন কিন্তু মৃত নয়। আমরা যদি নিজে শয়তানের কাছাকাছি যায়, তাহলে তো তার সুযোগ থাকছে আমাদের আক্রমণ করার।

এজন্যই তো মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় শয়তানকে প্রকাশ্য শত্রুরূপে চিহ্নিত করে তার পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন : 'হে মুমিনগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(আল-বাক্বারা, ২/২০৮)*।

আহমাদ বোতল থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে তিন ঢোক পান করে পুনরায় বলতে লাগল, 'আরেকটি কারণ হলো, যদিও শয়তান রামাযান মাসে বাঁধা থাকে, কিন্তু বাকি এগারো মাস সে মুক্ত থাকে। ঐ এগারো মাস মানুষের অন্তরে সর্বদা কুমন্ত্রণা দিয়ে তাকে পাপে জড়ানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে মানুষ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেই প্রভাব রামাযান মাসেও থাকে। এর একটা উদাহরণ দিই— ভারতে জিও[৮] সিম যখন মার্কেটে প্রথম লঞ্চ করে, তখন 4G ফুল স্পিড ফ্রি ডাটা দিয়েছিল প্রায় ছ'মাস। তখন অনেক 2G গ্রাহক সরাসরি ফ্রি ইন্টারনেটের জন্য 4G সিম করে জিও-তে পোর্ট করেছিল। — মনে আছে নিশ্চয়ই তোদের! অনেকে বলেছিল, ছয় মাস তো ফ্রি চালিয়ে নিই, তারপর বন্ধ করে দেব'।

ফাহিম এক গাল হেসে বলল, 'আর সে কথা বলিস নে ভাই! তখন আমাদের গ্রামে জিও'র নেটওয়ার্ক থাকত না বলে আমি প্রায় পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দূরে হাই রোডের কাছে গিয়ে ইন্টারনেট এক্সেস করেছি'।

আহমাদ বলল, 'তোরা কেউ বলতে পারবি ছয় মাস বা এক বছর 4G ফুল স্পিডে ফ্রি ইন্টারনেট চালিয়ে কতজন আবার 2G-তে ফিরে গেছে। এখন প্রতি মাসে মিনিমাম রিচার্জ প্যাক কত— বলতো; তারপরও সবাই রিচার্জ করে চলেছে ইন্টারনেট পরিষেবার জন্য।

—কারণ কী জানিস?

—আসক্তি।

—কোম্পানি ভালো করে জানত যে, প্রথমে কোটি কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট করে ফ্রি পরিষেবা দিলে; তারপর যখন তাদেরকে

৮. 'জিও' হলো একটি ভারতীয় মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা। এটি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মালিকানাধীন।

www.al-itisam.com

আসক্তি গ্রাস করবে, তখন যত টাকার প্যাকেজ করা হোক না কেন, তারা রিচার্জ না করে থাকতে পারবে না'।

'হ্যাঁ, আজকে আমরা ভাবতেও পারি না যে, 4G ছেড়ে নিচের দিকে যাব'। —ফাহিম বলল।

'অনুরূপভাবে, শয়তান এগারো মাস কুমন্ত্রণা দিয়ে আমাদের মনে পাপের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করেছে। তাই শয়তান এখন বন্দী থাকলেও আমাদের পাপ বন্ধ হয়নি।

—আরেকটা উদাহরণ শোন। যেমন : একটি চলন্ত ফ্যানের সুইচ অফ করা হলো, তারপরও কিছুক্ষণ ফ্যানটা ঘুরতে থাকে; ঠিক তেমনি আমাদের অবস্থা।

—আমাদের গ্রামে এক মাওলানা থাকতেন। আব্বার মুখে শুনেছি, তিনি রামাযান মাসে এই বিষয়টি বোঝাবার জন্য জুমাআর খুৎবায় একটি উপমা দিতেন। উপমাটি হলো, যারা সাইকেলিং করে তারা নিশ্চয় জানে, সাইকেলের প্যাডেল কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিলেও সাইকেল কিছুদূর এগিয়ে যায় বিনা প্যাডেলে।

—ঠিক একই অবস্থা আমাদের। এই মাসে শয়তান উপস্থিতি না থাকলেও যারা এগারো মাস শয়তানের প্রতি আসক্ত; শয়তানকে খোঁজার আগ্রহ তাদের মাঝে প্রবল থাকে'।

একটু থেমে আহমাদ পুনরায় বলতে শুরু করল, 'এর তৃতীয় যে কারণ তা হলো, অনেক আলেম বলে থাকেন যে, পবিত্র রামাযান মাসে বড় বড় শয়তানদের বেঁধে রাখা হয়, কিন্তু ছোট ছোট শয়তানেরা মুক্ত থাকে এবং তারাই মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়।[৯] আবার আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, কুমন্ত্রণা প্রদানকারী শয়তান মানব ও জিন উভয় জাতির মধ্যে থেকে হয়ে থাকে। এখানে হয়তো মহান আল্লাহ জিন জাতির শয়তানকে বন্দি করেন; কিন্তু মানব জাতির শয়তান মুক্ত থাকে, ফলে মানুষ খারাপ কাজের দিকে ধাবিত হয়'।

আহমাদ থামল। জোরে শ্বাস ছাড়ল।

ফাহিম সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তার মানে কনক্লুশন এটাই যে, রামাযান মাসে শয়তান বন্দী, তবে তারা মৃত নয়। কেউ যদি নিজে থেকে শয়তানি করতে শয়তানের কাছে যায়, তাহলে শয়তান তাকে পেয়ে বসে। আবার এগারো মাসের পাপের আসক্তি থেকেও পাপ করে। আবার মানুষরূপী শয়তানেরা বন্দী থাকে না, যারা বন্দী থাকে তারা হলো জিন শয়তান। সর্বোপরি, মানুষ শুধুমাত্র শয়তানের কুমন্ত্রণাতেই পাপ করে না। আপন কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েও পাপ করে থাকে, যেখানে শয়তানের উপস্থিত থাকা জরুরী নয়'।

আহমাদ বলল, 'অ্যাবসলিউটলি রাইট।

—তবে, সামগ্রিকভাবে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখতে পাব, রামাযান মাসে অন্য মাসের তুলনায় পাপের পরিমাণ কম হয়। মুসলিমদের ধার্মিকতা বৃদ্ধি পায়। যারা ছিয়াম পালন করে, তাদের উপর শয়তানের কুমন্ত্রণা, নাফসে আম্মারার প্ররোচনা কার্যকর হয় না। এটাই মহান আল্লাহর হিকমত। আমরা যদি বিশুদ্ধ নিয়্যতে ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত হই, ইসলামের গাইডলাইনগুলো ফলো করি; তাহলে নিশ্চিতভাবে শয়তান আমাদেরকে প্ররোচিত করতে পারবে না।

—আর একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সকল শয়তানকে বন্দী করা হলেও খারাপ কাজ বা পাপ কাজ একেবারে না ঘটা অনিবার্য নয়। কেননা শয়তান ছাড়াও অন্যান্য কারণেও পাপ কাজ ঘটে থাকে। যেমন : কলুষিত অন্তরগুলোর কারণে, খারাপ অভ্যাসের কারণে এবং মানুষরূপী শয়তানগুলোর কারণে'।[১০]

আমরা প্রত্যেকে একে অপরের দিকে চেয়ে আছি। খাওয়া অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আলোচনা শুনতে শুনতে এঁটো হাত শুকিয়ে গেছে। থালারও একই অবস্থা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে, থালা পরিষ্কার করে ঘুমিয়ে পড়। আবার শেষ রাতে সাহারীর জন্য উঠতে হবে। জিনরূপী শয়তান তো বন্দী হয়েছে, কিন্তু মানুষরূপীগুলো তো ছাড়া। নিজেদেরকেই সতর্ক থাকতে হবে। না হলে...'।

৯. https://youtu.be/fKCZWDWkMyg.

১০. https://islamqa.info/amp/bn/answers/12468.

www.al-itisam.com

দুনিয়াবী জীবন

*-সোলায়মান সরকার**

বাহিরে বৃষ্টি পড়ছে। মেঘের গর্জন শুনে আব্দুর রহীমের ঘুম ভেঙে গেল। সে ঘুম থেকে উঠে দেখল সকাল ৫:৩০ বাজে। সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠল। তারপর গিয়ে ওযূ করে ছালাতে দাঁড়ালো। ছালাত শেষ করার পর সে যখন দু'আ পড়ছিল, তখন সে তার স্ত্রীর চিৎকার শুনতে পেল। তার স্ত্রী ছিল গর্ভবতী, তার স্ত্রীর পেটে খুব ব্যথা হচ্ছিল। তার স্ত্রীর চিৎকারে বাড়ির সকলে দৌঁড়ে এলো। আব্দুর রহীমের মা বললেন, 'এখন কী হবে? আমার বউমার কী হলো?' এ বলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। আব্দুর রহীমের পিতা তার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর উপর ভরসা রাখো, কিছু হবে না ইনশা-আল্লাহ। আব্দুর রহীমের বড় ভাই তাদের প্রতিবেশীকে তাদের ভ্যান নিয়ে আসতে বলল। তখন তাদের প্রতিবেশী হাসিবুল ইসলাম বৃষ্টির মধ্যে কষ্ট করে হলেও তাদের বাড়িতে আসল। বৃষ্টির পানিতে রাস্তা কর্দমাক্ত রয়েছে। কর্দমাক্ত পথে খুব কষ্ট হচ্ছে ভ্যান নিয়ে যেতে। সন্তানসম্ভবা স্ত্রী নাসিমা বেগম অবর্ণনীয় ব্যথা অনুভব করছেন। খুব কষ্টে তারা হাসপাতালে পৌঁছালো। তাকে হাসপাতালের একটি কেবিনে নেওয়া হলো। পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, কিন্তু কোনো খবর আসে না। এক ঘণ্টা পর একজন নার্স এসে খবর দিলেন, নাসিমার দুটি ছেলে সন্তান হয়েছে। আব্দুর রহীম নার্সকে বললেন, আমি কি আমার স্ত্রী ও সন্তানের সাথে দেখা করতে পারি? তখন নার্স বললেন, অবশ্যই। দুটি সন্তানই দেখতে ফুটফুটে সুন্দর। তিনি একটি ছেলের নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ আরেকজনের নাম রাখলেন সাব্বির।*

দেখতে দেখতে তারা বড় হলো। দুই ভাই-ই পড়াশুনায় খুব ভালো। সাব্বির খুব চতুর, কিন্তু আব্দুল্লাহ খুব বোকা। সে প্রায় মানুষের কাছে ঠকে যায়। একদিন সাব্বির বসে বসে ভাবে যে, মাদরাসা পড়া বেশি সহজ নাকি স্কুলে পড়া। সে তার ধারণা অনুযায়ী দেখল স্কুলে পড়া খুব সহজ। তাই সে তার মা-বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোরপূর্বক স্কুলে ভর্তি হলো। এদিকে আব্দুল্লাহ একটু বোকাসোকা মানুষ কিন্তু মনের দিক থেকে অনেক সরল ও ভালো। সে তার মা-বাবার কথা অনুযায়ী মাদরাসায় ভর্তি হলো। দুই ভাইয়ের খুব ভালো পড়াশুনা চলছে। আব্দুর রহীম তার দুই ছেলেকেই ভালোবাসতেন। কিন্তু সাব্বির সব কিছুতেই ধান্দা খুঁজত। একবার সে তার বন্ধুদের সাথে কুটবুদ্ধি আঁটলো। তারপর সে তার বাবাকে বলল, 'বাবা, আমার একটি মোবাইল ফোনের খুব প্রয়োজন। আমার ক্লাসের পড়া বুঝতে ও কিছু বই পড়তে মোবাইলের খুব প্রয়োজন হয়। তার বন্ধুরাও তার সাথে সায় দিল। আব্দুর রহীম কোনো উপায় না পেয়ে তাকে মোবাইল ফোন কিনে দিল। দুই ভাই বড় হলো। সাব্বির ইঞ্জিনিয়ার হলো আর আব্দুল্লাহ মাদরাসায় পড়াশুনার পর মেডিকেলে পড়াশুনা শেষ করল। সে একজন বড় ডাক্তার এবং আলেম হলো। আব্দুল্লাহ এবং সাব্বিরের পড়াশুনার সময় আব্দুর রহীম তার জমি ও বাড়ি বন্ধক রেখে সেই টাকা সাব্বির ও আব্দুল্লাহর পোড়াশুনায় ব্যয় করেছিল। তারা পড়াশুনা শেষ করে চাকরি করে ভালো অর্থ উপার্জন করতে থাকে। তাদের পিতাকে যারা টাকা ধার দিয়েছিলেন তারা এখন তাদের পাওনা চাইতে আসলে তিনি তার ছেলেদের কাছে টাকা চাইলে সাব্বির বলাল, 'বাবা, আমার উপার্জিত অর্থ দিয়ে আমার নিজেরই চলে না, তোমাকে কী দিব? অন্য দিকে আব্দুল্লাহ তার তার কাছে গচ্ছিত সব টাকা দিয়ে দিল। সাব্বির বিদেশে চলে গেল। আব্দুর রহীমের কাছে যারা টাকা পেত, তারা বারবার এসে বলতে লাগল, সে যদি তাড়াতাড়ি ঋণের টাকা না পরিশোধ করে, তাহলে তার সব বন্ধকী সম্পদ বিক্রি করে টাকা আদায় করে নিবে। আব্দুর রহীম ও নাসিমা বেগম এই কষ্ট সহ্য করতে পারছিল না। নাসিমা বেগম তার ছেলে সাব্বিরকে কল দিয়ে বললেন, বাবা, আমরা তোমার জন্য কত কষ্ট করেছি, আমাদের সম্পদ এখন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের সম্পদগুলো রক্ষা করো। সাব্বির বলল, কোথায় তোমরা কষ্ট করেছ, বরং আমিই সারা জীবন কষ্ট করেছি। একথা শুনে নাসিমা বেগম দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। তখন আব্দুল্লাহ বাড়িতে ফিরল, তারপর তার মায়ের হাতে কিছু কাগজ দিয়ে বলল, 'মা, এই নাও আমি সকল বন্ধকী সম্পদ ছাড়িয়ে নিয়েছি'। তখন আব্দুর রহীম ও নাসিমা কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'আল-

* সপ্তম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

www.al-itisam.com

হামদুলিল্লাহ, আমাদের একটা ছেলেতো ভালো শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কয়েক বছর পরে আব্দুর রহীম সাহেব মারা গেলেন। আব্দুল্লাহ তার ভাই সাব্বিরকে কল দিয়ে বলল, 'ভাইয়া, আমাদের বাবা আর বেঁচে নেই, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়িতে চলে এসো'। তখন সাব্বির অনেক বিরক্তির সাথে বলল, তুই তো জানিস না আমি কত ব্যস্ত, আর আমি এখন ছুটি নিতে পারব না; এখন ছুটি নিলে আমার চাকরি চলে যাবে, তুই ওদিকে দেখে নে'। এরকম অনেক দিন কেটে গেল, তারপর নাসিমা বেগমও মারা গেলেন। আব্দুল্লাহ সাব্বিরকে কল দিয়ে এই খবর জানালে সে আবারো বিভিন্ন বাহানা দিতে থাকে। কিছুদিন পর আব্দুল্লাহ সাব্বিরকে কল দিয়ে বলল, 'বাবা-মা আমাদের জন্য সম্পদ রেখে গেছেন, তা ভাগাভাগি হবে তাড়াতাড়ি চলে এসো। তখন সাব্বির বলল, 'সমস্যা নেই, যেতে আর কী এমন সমস্যা, শুধু প্লেনে উঠা আর দেশে চলে আসা। সাব্বির লোভ করে দেশে আসলো, জমি ভাগাভাগি হলো। কিন্তু কিছুদিন পরে তার চাকরি চলে গেল। সে আব্দুল্লাহর বাসায় থাকতে লাগল। কিছুদিন পর সাব্বির হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ তার ভাইকে খোঁজার অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু সে আর তার ভাইকে খুঁজে পেল না। এর কিছুদিন পরে একটি ড্রেনে লাশ পাওয়া গেল। আব্দুল্লাহ জানতে পারল সেই লাশটা নাকি তার ভাইয়ের মতো দেখতে। সে তাড়াতাড়ি সেখানে গেল এবং দেখল সেটা আসলেই তার ভাইয়ের লাশ। পুলিশ অনুসন্ধান করে দেখল যে, সাব্বির বে-আইনী কাজ করত। তার লোক দেখানো চাকরি চলে যাওয়ার পর সাব্বিরের সাথী তার পাওনা চাওয়ার পর সাব্বির তাকে টাকা না দিতে পারায় সাব্বিরের সাথী তাকে মেরে বস্তায় ভরে ড্রেনে ফেলে রেখেছিলে।

দারসে হাদীছ-এর বাকী অংশ

এমন কোনো রোগ-ব্যাধি নেই, যে চিকিৎসা পদ্ধতি তিনি মানুষকে শিক্ষা দেননি। রোগ-ব্যাধি যেমন তিনি দিয়ে থাকেন, রোগ মুক্তির ব্যবস্থাও তিনি দিয়েছেন। তিনিই আমাদের একমাত্র প্রতিপালক। তিনি ছাড়া রোগমুক্তিদাতা কেউ নেই। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি, যার নিরাময়ের উপকরণ তিনি সৃষ্টি করেননি'। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, তা হচ্ছে আল্লাহর এক প্রকার আযাব। যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তার উপর প্রেরণ করেন। তবে আল্লাহ মুমিনের জন্য একে রহমত বানিয়ে দিয়েছেন'। রোগ-ব্যাধির প্রাদূর্ভাবের সময় মুমিনদেরকে কখনো হতাশ হওয়া যাবে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা হতোদ্যম হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তাহলে তোমরা বিজয়ী হবে' *(আলে-ইমরান, ৩/১৩৯)*। 'আমি যখন মানুষদের অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে খুশি হয়; আবার যখন তাদেরই (মন্দ) কাজের কারণে তাদের উপর কোনো মুছীবত পতিত হয়, তখন তারা সাথে সাথেই নিরাশ হয়ে পড়ে' *(আর-রূম, ৩০/৩৬)*। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিপদাপদকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা দিন। গভীর বিপদ, ভয়াবহ বিপর্যয়, কঠিন রোগ-ব্যাধিকে প্রকৃত রহমত ও অফুরন্ত কল্যাণ লাভের মাধ্যম মনে করতে পারি সেই তাওফীক্ব আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন। এমন রোগ-ব্যাধি, বালা-মুছীবত ও মহামারি থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, যা আমরা সহ্য করতে পারব না বা যেগুলোকে আমরা শাস্তি বা আযাব বলে মনে করব- আমীন! ছুম্মা আমীন!

কবিতা

ধর্ষিতা

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক
ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
বানারাস, ভারত।

পড়ে আছে কচি পাপড়িসম তনু খানি
অস্ফুট কোরকসম অবয়ব খানি,
কচি কিছু সুপারি গাছের ছায়ায়
নিবিড় প্রকৃতির প্রেম মায়ায়।
জড়িয়েছে যেন মৃত্তিকা তারে প্রেম রেখায়
আঁকড়ে রয়েছে মানিক খানি পরম মায়ায়,
পড়ে আছে করুণ কোমল তনু খানি
হাত মুখ বাঁধা স্নিগ্ধ, সুকুমার পুষ্প খানি।
কালো ভ্রু তলে চির নিমীলিত আঁখি
হৃদয় ভরা অশ্রুভার গুঞ্জরিয়া চাহি,
গগণ অন্ধকার ফুঁড়ে কঠিন ইনছাফ বাণী
আসমান পরে প্রভুর আরশে চাহি।
অস্ফুট কোরকসম অবয়ব খানি
ধিক্কারে কঠিন অপমান বাণী,
মানবতার বুকে ব্যর্থ আঘাত হানি
জানায় সমাজের নির্লজ্জতার আঁচল টানি,
শিক্ষার কপট দ্যুতির নিঃস্বতা ভাঙি
আধুনিকতার আড়াল ছিড়ে আসল রূপ খানি।

সত্যের পথ

-ওমর ফারুক বিন মুসলিমুদ্দীন
ছাত্র, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।

আঁধার মাঝে অচেনা পথ পাড়ি দিলে
ভয়-ভীতির সঞ্চার ঘটে মনে;
আলোর পথের পথিক হলে নিকট
ভবিষ্যতেই সাক্ষাৎ ঘটবে জয়ের সনে।
সরল সহজ সঠিক পথে চললে
সত্যের নাগাল তবেই মিলে;
মনের গহীনে উঁকি দিলে আলো
মন হয় প্রাণবন্ত ঝলমলে।
সত্যের পথে চলা যায় শির উঁচু করে
সিংহের মতন সাহসের গর্জন দিয়ে;
মিথ্যার পথে আসে কত যে বাধা আর
চলতে হয় ভেজা বিড়াল হয়ে।
সত্য নিয়ে অগ্রপানে আসবে হয়তো
বর্ণনাতীত শত-সহস্র বাধা-বিপত্তি,
মহান রবের দয়ায় অগ্রের বাধায়
আমাদের নেই কোনো আপত্তি।
সঠিক পথে চললে প্রভু
সদা সত্য করেন সার,
আলোর পথে থাকলে তবেই
দয়াময় প্রভু করেন পার।

জাগো জাগো হে মুসলিম

-মো. নূরুজ্জামান সবুজ

আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম
জাগো জাগো হে মুসলিম,
অন্ধ রজনী বন্ধ হলো
মিনার থেকে ঐ আসে আযান।
পাতিয়া জায়নামায ফরিয়াদ করো
তুলে ধরো দুটি হাত,
প্রদীপ্ত দ্বীন দান করো মলিক
ঢেলে দাও রহমত।
দয়াময় রহমান মায়া দিয়ে তুমি
সৃজিলে মাখলূক্বাত,
শ্রেষ্ঠ করিলে আদমের জাতি
দানিলে জান্নাত।
তৌহিদের উড়াতে নিশান
দাও শক্তি ও বল
তোমার আদেশ মানিয়া চলিতে
থাকি যেন অবিচল।

বাংলাদেশ সংবাদ

বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশ

স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটল বাংলাদেশের। ২০১৮ সালের মার্চে প্রথমবারের মতো এবং ২০২১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্তভাবে এই সুপারিশ করেছে জাতিসংঘ। ফলে বাংলাদেশের এখন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ভোগ করতে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা রইল না। মাথাপিছু জাতীয় আয়, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা-এই তিন সূচকে বিচার করা হয় একটি দেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল ধাপে উত্তরণ করবে কি-না। উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে হলে অন্তত দুটি সূচক পূরণ করতে হয় একটি দেশকে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম দেশ হিসেবে তিনটি সূচকের সব কটি পূরণ করে পরবর্তী ধাপে উন্নীত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের বিবেচনায় বাংলাদেশ ২০১৫ সালের জুলাইয়ে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়। এখন জাতিসংঘের মাপকাঠিতেও বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটল। জাতিসংঘ তার সদস্য দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত (এলডিসি), উন্নয়নশীল ও উন্নত-এই তিন পর্যায়ে বিবেচনা করে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল (ইকোসক)-এর মানদণ্ড অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশ হতে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হয় কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার, জাতিসংঘের হিসাবে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন ১২৭৪ মার্কিন ডলার। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে, মাথাপিছু আয় এখন ১৬১০ ডলার। মানবসম্পদ সূচকে উন্নয়নশীল দেশ হতে ৬৪ পয়েন্টের প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশের আছে ৭২। অর্থনৈতিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পয়েন্ট এখন ২৫.২। এই পয়েন্ট ৩৬-এর বেশি হলে এলডিসিভুক্ত হয়, ৩২-এ এলে উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা অর্জিত হয়।

৩ দশক পড়াশোনা করে ইসলাম গ্রহণ করলেন জবি অধ্যাপক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রিতু কুণ্ডু। তিনি ছাত্রজীবনে পুরোটা সময় আগ্রহ নিয়ে করেছেন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক পড়াশুনা। এসময় হিন্দু ধর্মসহ প্রধান সব ধর্মের গ্রন্থাবলি পাঠ করেন তিনি। জাপানে এ বিষয়ে পড়াশোনাও করেন। কিন্তু পরে বুঝতে পারেন, এগুলো মানুষের রচিত বই। এরপর পড়াশোনা ও জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে ইসলাম বিষয়ে এক মাসব্যাপী পড়াশোনা শুরু করেন তিনি। ১৬ দিনের মধ্যেই তিনি সত্য উপলব্ধি করতে পারেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। অধ্যাপক রিতু কুণ্ডু এক ভিডিওতে বলেন, 'দীর্ঘ ২৯ বছর পর্যন্ত আমি নিজের পরিবার, সমাজ ও মানুষের আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করি। এ দীর্ঘ সময় হিন্দু ধর্মসহ প্রধান সব ধর্মের গ্রন্থাবলি পাঠ করেছি। জাপানেও এ বিষয়ে পড়াশোনা করি। ২০১২ সালে এসে বুঝতে পারি, এগুলো মানুষের রচিত বই। দীর্ঘ ২৯ বছর পর আমি পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদ পাঠ করি। এর পাশাপাশি আমি হাদীছও পাঠ করি। সামনে কুরআনের যে সূরা আর হাদীছ পেয়েছি, তা-ই মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। মহান আল্লাহর নির্দেশনার কারণ ও বিধিনিষেধ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি। কখনও এ বিষয়ে স্বপ্নও দেখেছি। তা হয়তো অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। খুব ছোট থেকেই হয়তো আল্লাহ আমাকে ইসলাম কবুলের জন্য তৈরি করেছিলেন। ছোট থেকে আজ পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ঘটনা, শিক্ষা, প্রতিবন্ধকতা আর সমাজের অসংগতি আমাকে ধীরে ধীরে ইসলামের পথে পরিচালিত করেছে। আমি যখন বুঝতে পারলাম, আমাকে ছালাত আদায় করতে হবে, সেদিন থেকে টানা ১৪ মাস আমার ছালাত ক্বাযা হয়নি। এরপর চাকরির কারণে দু-একবার ক্বাযা হয়ে যায়। আমি যখন অনুভব করলাম, আমাকে পর্দা করতে হবে, সেদিন থেকে আমি হিজাব পরা শুরু করি। পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন বলেও জানান এ শিক্ষিকা। নীলফামারী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও নীলফামারী সরকারি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন আদ্রিতা জাহান রিতু। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ২০১৩ সালে তিনি রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। ২০১৭ সাল থেকে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগে শিক্ষকতা করছেন।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

বিশ্বব্যাপী খাদ্য অপচয়ের বিস্ময়কর তথ্য

বিশ্বে প্রতি বছর মানুষ ৯৩ কোটি টন খাদ্যের অপচয় করছে, যেখানে বিশ্বব্যাপী উৎপাদিত খাদ্যের মজুদ ৫৩০ কোটি টন। জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি প্রকাশিত খাদ্য অপচয় সূচক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি খাদ্য অপচয় নিয়ে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বিস্তৃত প্রতিবেদন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বে প্রতিবছর একজন মানুষ গড়ে ১২১ কেজি খাদ্য অপচয় করে। এর মধ্যে ঘরবাড়িতে ৭৪ কেজি, হোটেল বা রেস্টুরেন্টে ৩২ কেজি আর রিটেইল বা খুচরা দোকানে ১৫ কেজি খাদ্য। এই হিসেবে, ভোক্তাদের কাছে যাওয়া মোট ১৭ শতাংশ খাদ্য বাড়ি, খুচরা দোকান, রেস্তোরাঁ কিংবা অন্যান্য খাদ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের ডাস্টবিনে ফেলা হয়েছে। আগে ভাবা হতো, কেবল ধনী দেশগুলোতেই খাদ্য অপচয় হয়। তবে

জাতিসংঘের এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিস্ময়করভাবে দেখা গেছে, প্রায় সব দেশেই খাদ্য অপচয়ের মাত্রা সমান। এমনকি আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোও রয়েছে এই তালিকায়। যেসব দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি খাদ্য অপচয় করে তার প্রথমে রয়েছে নাইজেরিয়া (মাথাপিছু ১৮৯ কেজি), দ্বিতীয় অবস্থানে রোয়ান্ডা (মাথাপিছু ১৬৪ কেজি), তৃতীয় অবস্থানে গ্রীস (মাথাপিছু ১৪২ কেজি)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে একজন ব্যক্তি প্রতিবছর বাড়িতে গড়ে ৬৫ কেজি খাদ্য অপচয় করে থাকে। অথচ এক হিসেবে দেখা যায়, বিশ্বের ৮০ কোটি মানুষ ক্ষুধা আর অপুষ্টিতে ভোগে। জাতিসংঘ বলছে, বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের খাবারের অপচয় হয়।

কাতার বিশ্বকাপ : ১০ বছরে সাড়ে ৬ হাজার শ্রমিকের মৃত্যু

বিশ্বখ্যাত ইংরেজি পত্রিকা গার্ডিয়ানে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারে বিশ্বকাপ আয়োজন সম্পর্কে উঠে এসেছে চমকে দেওয়া এক তথ্য। গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ১০ বছর আগে বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পাওয়ার পর এর প্রস্তুতিতে সেখানে সাড়ে ৬ হাজারের বেশি দক্ষিণ এশীয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তুতি শুরুর পর থেকে কাতারে প্রতি সপ্তাহে গড়ে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০১১ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ৫ হাজার ৯২৭ জন প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে মৃত বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা ১ হাজার ১৮। কাতারে পাকিস্তানের দূতাবাস থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এ সময়ে ৮২৪ জন পাকিস্তানি শ্রমিক মারা গেছেন মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশে। কাতারে শ্রমিক সরবরাহে অনেক এগিয়ে থাকা ফিলিপাইন ও কেনিয়ার নাগরিকদের মৃতের সংখ্যা অবশ্য জানা যায়নি। সে কারণেই কাতারে প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যুর সঠিক সংখ্যাটি আরও অনেক বড় বলেই সন্দেহ গার্ডিয়ানের। উল্লেখ্য, গত ১০ বছরে বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য অভাবনীয় সব প্রকল্প হাতে নিয়েছে কাতার। সাতটা নতুন স্টেডিয়াম বানানো হয়েছে। এর সঙ্গে আরও অনেকগুলো বড় বড় প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে দেশটি। নতুন একটি বিমানবন্দরসহ নতুন রাস্তাঘাট ও আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। এত বড় বড় সব স্থাপনা ও উন্নয়নকাজের জন্য অসংখ্য কর্মশক্তির দরকার হয়েছে দেশটির। বিশ্বকাপ উপলক্ষে ২০ লাখ প্রবাসী শ্রমিক এখন কাতারে অবস্থান করছেন।

মুসলিম বিশ্ব

সিরিয়ার অন্ধ হাফেযা যাহরার শিক্ষাব্রত

সিরিয়ার অন্ধ হাফেযা যাহরা দারজি উলুশ। বয়স মাত্র ১৫। সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি শরণার্থী শিবিরে বসবাস। প্রখর মেধা ও অনন্য যোগ্যতার কারণে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নানা প্ল্যাটফর্মে তাকে নিয়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। স্বল্পবয়সী বালিকা হয়েও সে শিবিরের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিচ্ছে। যাহরা চায় শিবিরের সব শিশু তার থেকে কুরআন শিখুক। সে লক্ষ্যে শিবিরের মন্দ পরিবেশের মধ্যেও শিশুদের একত্রিত করে তাজবীদসহ কুরআনের বহুমুখী পাঠদান চলছে। শরণার্থী শিবিরের যে পরিবেশে সে এবং অন্যান্য শিশু বেড়ে উঠছে, তা থেকে মুক্তি চায় যাহরা। সে এখনো বালিকা। মাদরাসায় পড়ার স্বপ্ন দেখে। তার ইচ্ছা অনেক বড় হয়ে শিক্ষকতা করবে। গত ২০১৯ সালের এক দাঙ্গায় সিরিয়ার মাআরাত পল্লী থেকে যাহরা সপরিবারে বাস্তুচ্যুত হয়ে আশ্রয় নেয় এই শরণার্থী শিবিরে। একই সঙ্গে ঘরবাড়ি, সহায়-সম্বল ও আত্মীয়-স্বজন সবাইকে হারায়। কিন্তু অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও দুর্দান্ত আগ্রহ শিক্ষাগ্রহণ থেকে তাকে বিরত রাখতে পারেনি। ঘরে বসেই শুনে শুনে পুরো ৩০ পারা কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেছে সে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

১০০ মানুষ নিয়ে স্টারশিপ যাবে মঙ্গলে

মঙ্গলযাত্রার জন্য খুব শীঘ্রই মহাকাশযান স্টারশিপের প্রটোটাইপ উন্মোচন করতে যাচ্ছে স্পেসএক্স। পুনরায় ব্যবহারযোগ্য স্টারশিপে করে মঙ্গলগ্রহে একসঙ্গে ১০০ মানুষ পাঠানোর প্রকল্প হাতে নিয়েছে স্পেসএক্সের প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক। মহাকাশ যানের ওপরের অংশটির নাম স্টারশিপ। এর উচ্চতা ৫০ মিটার। নিচের অংশে থাকবে সুপার হেভি বুস্টার নামের রকেট। মঙ্গলগ্রহে মানুষের বসতি স্থাপন করার পরিকল্পনা থেকেই এ প্রকল্প। একসময় অন্য গ্রহের সঙ্গে সংঘর্ষে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে পৃথিবী থেকে প্রাণের অস্তিত্ব বিলীন হতে পারে। যৌথভাবে মহাকাশ যান ও রকেটের উচ্চতা হবে ১২০ মিটার। মহাকাশে যাত্রা করার সময় সুপার হেভিতে থাকবে ছয়টি র‍্যাপটর। ওপরে আর নিচে থাকবে চারটি পাখা। শুধু র‍্যাপটর তৈরিতে এক দশকেরও বেশি সময় লেগেছে। সুপার হেভি বুস্টার রকেটের ওজন হবে ৩ হাজার ৩৩০ টন। ওড়ার সময় স্টারশিপ ও সুপার হেভি আলাদা হয়ে যাবে। সুপার হেভি পৃথিবীতেই রয়ে যাবে। স্টারশিপ চলে যাবে মঙ্গলে। ফিরে আসবে ৯ মাস পর। প্রতিটি স্টারশিপে ৪০টি কেবিন থাকবে। প্রতিটি কেবিনে থাকবে ৩ জন। স্টারশিপের ভেতরে করে ১০০ টনের বেশি পণ্য ও ১০০ মানুষ কক্ষপথে পাঠানো সম্ভব হবে।

জামি'আহ সংবাদ

সালাফী কনফারেন্স-২০২১

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ৪ ও ৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার : আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত দুইদিনব্যাপী **'সালাফী কনফারেন্স-২০২১'** নানা বন্ধুর পথ পেরিয়ে বাংলাদেশের অত্যাধুনিক সিটি পূর্বাচলের অদূরে বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ ময়দানে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। *ফালিল্লাহিল হামদ*। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ ও রাজশাহীর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৫ম বার্ষিক সালাফী কনফারেন্সে ইসলাম প্রিয় মানুষের আশাতীত সমাগম হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ, খুলনা, রংপুর ও রাজশাহীসহ বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে বিমান, বাস, মাইক্রো-বাস, ট্রেন ও লঞ্চ ইত্যাদি যোগে দ্বীনদরদী মুসলিম ভাই-বোনেরা কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

১ম দিন বাদ আছর আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-এর ৭ম শ্রেণির ছাত্র হাফেয মাহবুবুর রহমানের কুরআন তেলাওয়াত ও তার সাথীদের তিন ভাষা আরবী, বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে কনফারেন্সের কার্যক্রম শুরু হয়। ইসলামী সংগীত পরিবেশন করে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর ছাত্র আব্দুল্লাহ নীরব ও সহশিল্পীবৃন্দ। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

সালাফী কনফারেন্সে ১ম দিন পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, শায়খ আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম, ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, শায়খ আব্দুন নূর মাদানী, মুস্তফা মাদানী সালাফী, প্রফেসর মুখতার আহমাদ, সাঈদুর রহমান রিয়াদী, আব্দুল মতীন মাদানী, ড. রফীকুল ইসলাম মাদানী, সাইফুল ইসলাম মাদানী, রফীকুল ইসলাম বিন সাঈদ, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক মাদানী, আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ, আরমান উদ্দীন, ইসরাফিল বিন তমীজ উদ্দীন প্রমুখ। এছাড়া আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর ছাত্রদের মধ্যে মামূনুর রশীদ, নাঈম ও আব্দুস সামাদ, ফারেগ ছাত্র হাবীবুল্লাহ ও শহীদুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন।

সালাফী কনফারেন্স ২০২১-এর ২য় দিন বাদ ফজর উমায়ের-এর কুরআন তেলাওয়ত, সাজেদুর-এর ইসলামী সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সকালের অধিবেশন শুরু হয়। দারসে কুরআন পেশ করেন প্রফেসর মুখতার আহমাদ। এরপর সকলের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। এ পর্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক মাদানী এবং ফৎওয়া প্রদান করেন সাঈদুর রহমান রিয়াদী, আব্দুল আলীম বিন কাওছার মাদানী ও আব্দুল বারী বিন সোলায়মান। তারপর অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ পৃথক দু'টি নাটিকা মঞ্চস্থ করে। জুম'আর খুৎবা পেশ ও ইমামতী করেন মাননীয় কনফারেন্স সভাপতি শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বাদ জুম'আ থেকে আছর পর্যন্ত বিরতি থাকে।

২য় দিন বাদ আছর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে কনফারেন্সের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ-এর ৭ম শ্রেণির ছাত্র ত্বহা আর ইসলামী সংগীত পরিবেশন করে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র যিকরুর রহমান। এদিন পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তুসমূহের উপর বক্তব্য পেশ করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ড. মুহাম্মাদ মানযূরে ইলাহী, ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ, ড. ইমাম হোসাইন, ড. রেজাউল করীম মাদানী, মুহাম্মাদ মুস্তফা কামাল, শায়খ মুস্তাফীযুর রহমান মাদানী, শায়খ আব্দুল আলীম বিন কাওছার মাদানী, শায়খ আযহারুল ইসলাম নোমানী, আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী ও শায়খ তারেক হাসান বিন বেনজীর মাদানী প্রমুখ। আরো বক্তব্য পেশ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর ছাত্রগণের মধ্যে থেকে সিয়াম (৭ম), ইকরাম (ছানাবিয়্যাহ, ২য় বর্ষ), আব্দুল্লাহ রাসেল (ফারেগ), মুসলেহুদ্দীন (ফারেগ)।

সালাফী কনফরেন্স-২০২১, বিভিন্ন পর্যায়ে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মুহাম্মাদ মুস্তফা কামাল, শায়খ আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী, ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, আব্দুল বারী বিন সোলায়মান ও আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক প্রমুখ।

বিদায়ী ভাষণ : কনফারেন্সে আগত দ্বীনী ভাইদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ প্রদান করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। তিনি সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে নিজ নিজ গন্তব্যে ছহীহ-সালামতে পৌঁছার জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেন এবং বৈঠক শেষের দু'আ পাঠের মাধ্যমে কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

রামাযান ও ছিয়ামের গুরুত্ব ও ফযীলত

প্রশ্ন (১) : রামাযান মাসের প্রথম ১০ দিন রহমতের, দ্বিতীয় ১০ দিন মাগফিরাতের এবং তৃতীয় ১০ দিন নাজাতের। কথাটি কি ঠিক?

-হাসানুযযামন
ফরিদপুর সদর।

উত্তর : কথাটি ঠিক নয়। কারণ রামাযান মাসের প্রথম ১০ দিন রহমত, দ্বিতীয় ১০ দিন মাগফিরাত এবং তৃতীয় ১০ দিন জাহান্নাম থেকে নাজাত, মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ এবং একাধিক ছহীহ হাদীছ বিরোধী। যেমন রাসূল ﷺ বলেন, 'রামাযান মাস আসলে রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭৯)। অন্য আরেকটি হাদীছে রাসূল ﷺ বলেন, 'রামাযানের প্রথম রাত থেকেই একজন আহ্বানকারী বলতে থাকেন, কল্যাণকামী অগ্রসর হও, অকল্যাণকামী পিছু হটো। আর এভাবে রামাযানের প্রতি রাতেই আল্লাহ তাআলা কিছু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন (ইবনু মাজাহ, হা/১৬৪২; তিরমিযী, হা/৬৮২; মিশকাত, হা/১৯৬০)। উক্ত হাদীছদ্বয় ছাড়া অন্যান্য ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছেও রামাযান মাসকে এভাবে ভাগ করা হয়নি। সুতরাং পুরো রামাযানই রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস।

প্রশ্ন (২) : 'ছিয়াম অবস্থায় কেউ মারা গেলে কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় ছিয়ামের নেকী লেখা হবে'-এমন কথার কোনো শারঈ ভিত্তি আছে কি?

-শাহরিয়ার শাকীর
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : 'ছিয়াম অবস্থায় কেউ মারা গেলে কিয়ামত পর্যন্ত ছিয়ামের ছওয়াব পাবে' মর্মে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং তা মানব রচিত ও ভিত্তিহীন কথা মাত্র।

প্রশ্ন (৩) : অনেকেই বলেন, রামাযান মাসে জাহান্নামের শাস্তি বন্ধ থাকে। একথা কি ঠিক?

-শফিকুল ইসলাম
চাঁদমারী, পাবনা।

উত্তর : 'রামাযান মাসে জাহান্নামের শাস্তি বন্ধ থাকে' কথাটি ঠিক নয়। কেননা এখনো পাপীদেরকে জাহান্নামে দেওয়া হয়নি। সেটা হবে বিচারের মাঠে। বরং জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকে। আর এটা বলে মহান আল্লাহর এক বিশেষ দয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাহে রামাযান শুরু হলে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানকে শিকলবন্দী করা হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, 'রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৯, ৩২৭৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭৯; মিশকাত, হা/১৯৫৬)। এর অর্থ হলো- যে সমস্ত গুনাহ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়, তা থেকে তাদের ইচ্ছাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়া (তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/২৯২)।

সাহারী প্রসঙ্গ

প্রশ্ন (৪) : মানুষকে সাহারীর সময় জাগানোর জন্য মাইকে গযল গাওয়া, কুরআন তেলাওয়াত করা, বক্তব্য দেওয়া ও সাইরেন বাজানো যাবে কি?

-কামরুল হাসান
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : সাহারীর সময় মানুষকে জাগানোর নামে মাইকে গযল গাওয়া, কুরআন তেলাওয়াত করা, বক্তব্য দেওয়া ও সাইরেন বাজানো ইত্যাদির শারঈ কোনো ভিত্তি নেই। এগুলো সবই বিদআতী কার্যক্রম (ফাতহুল বারী, হা/৬২২-৬২৩-এর ব্যাখ্যা দ্র., ২/১২৩)। রাসূল ﷺ-এর সময়ে সাহরী ও তাহাজ্জুদের জন্য আযান দেওয়া হতো। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয় বেলাল গভীর রাতে আযান দেয় অতএব তোমরা খাও ও পান করো যতক্ষণ না উম্মে মাকতূম আযান দেয় (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৪৮)। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'বেলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহারী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা, সে রাত থাকতে আযান দেয় যেন তোমাদের মধ্যে তাহাজ্জুদ আদায়কারীগণ ফিরে যায় এবং ঘুমন্তদের জাগিয়ে দেয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৬২১)। অতএব বিদআতী পন্থা পরিত্যাগ করে সুন্নাতের উপর আমল করতে হবে।

ছিয়াম ভঙ্গের কারণ

প্রশ্ন (৫) : ছিয়াম অবস্থায় দিনের বেলা উত্তেজনাবসত মযী নির্গত হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : ছিয়াম অবস্থায় দিনের বেলা উত্তেজনাবসত মযী বের হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কেননা যে সকল কারণে ছিয়াম ভঙ্গ হয় মযী নির্গত হওয়া তার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সকল ক্ষেত্রে মযীকে পেশাবের ন্যায় বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পেশাব করলে যেমন ছিয়াম ভঙ্গ হয় না ঠিক তেমনি মযী বের হলেও ছিয়াম ভঙ্গ হবে না (আশ-শারহুল মুমতে' লি ইবনে উছায়মীন, ৬/৩৭৬; আল-মাজমু লিন-নাবাবী, ৬/৩২৩)। তবে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন সে উত্তেজনা স্বেচ্ছায় বা মিলনজনিত কারণে না হয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে একত্রে অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি এসে অনুরূপ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি যাকে অনুমতি দিয়েছেন সে ছিল বৃদ্ধ এবং যাকে নিষেধ করেছেন সে ছিল যুবক (আবূ দাঊদ, হা/২৩৮৭, সনদ হাসান ছহীহ)। এই হাদীছ প্রমণ করে মযী বের হবে এমন কাজ যুবকদের করা যাবে না।

প্রশ্ন (৬) : ছিয়াম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-আবূ বকর ছিদ্দীক
চিচিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : ছিয়াম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কেননা যে সকল কারণে ছিয়াম ভঙ্গ হয় স্বপ্নদোষ তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া এটি মানুষের সাধ্যের বাইরে অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না' (আল-বাক্বারা, ২/২৮৬)।

প্রশ্ন (৭) : ছিয়াম অবস্থায় ইনজেকশন নেওয়া যাবে কি?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : যেসব ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলো ছিয়াম অবস্থায় রোগমুক্তির জন্য গ্রহণ করা যাবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিয়াম অবস্থায় (রোগমুক্তির জন্য) শিঙ্গা লাগাতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৮; ইরওয়াউল গালীল, হা/৯৩২)। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথমে ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগাতে নিষেধ করতেন। কিন্তু পরে আবার অনুমতি প্রদান করেছেন (দারাকুত্বনী, হা/৭; বায়হাক্বী-সুনানুল কুবরা, হা/৮০৮৬, সনদ ছহীহ)। তবে যেসব ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় বা শরীরে শক্তি জোগায় তা গ্রহণ করলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৮) : ছিয়াম অবস্থায় কাঁচা ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা কিংবা পেস্ট দিয়ে ব্রাশ করা যাবে কি?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ছিয়াম অবস্থায় কাঁচা ডাল কিংবা পেস্ট দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার ছহীহ বুখারীতে অধ্যায় রচনা করে বলেন, بَابُ سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ 'ছিয়াম পালনকারীর কাঁচা কিংবা শুকনো ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা সম্পর্কে'। অতঃপর এর স্বপক্ষে তিনি হাদীছ নিয়ে এসেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি আমার উম্মতের জন্য কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক ওযূর সময় মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম' (ছহীহ বুখারী, ৩/৩১, ৭২৪০)। এখানে তিনি ছিয়াম পালনকারী ও সাধারণ মানুষের মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি। ইবনু সীরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ছিয়াম অবস্থায় কাঁচা ডাল দিয়ে মিসওয়াক করাতে কোনো সমস্যা নেই। তাকে বলা হলো, এর তো স্বাদ আছে? তিনি উত্তরে বললেন, পানিরও তো স্বাদ আছে। আর পানি দিয়ে তুমি কুলি করে থাক (ছহীহ বুখারী, 'ছিয়াম পালনকারীর গোসল করা' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্ন (৯) : ছিয়াম অবস্থায় কোনো রোগীকে রক্ত দিলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-রুস্তম আলী
রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছিয়াম অবস্থায় রোগীকে রক্ত দেওয়া যায়। এতে ছিয়াম নষ্ট হবে না। কেননা শরীর থেকে রক্ত বের হওয়া ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয়। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হজ্জের ইহরামের অবস্থায় এবং ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগাতেন (অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত ক্ষরণ বিশেষ উপায়ে করাতেন) (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৮; মিশকাত, হা/২০০২)। তবে রক্ত দেওয়ার কারণে কারো যদি এতটুকু দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে যে, সে ছিয়াম পূর্ণ করতে পারবে না তাহলে তার জন্য রক্ত দেওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন (১০) : কোনো ব্যক্তি যদি রামাযানের রাত্রিতে স্ত্রী সহবাস করে ঘুমিয়ে যায় এবং অপবিত্র অবস্থায় সাহারী খেয়ে ছিয়াম রাখে, তাহলে উক্ত ছিয়াম শুদ্ধ হবে কি?

-আব্দুছ ছামাদ
ডাকবাংলা, মেহেরপুর।

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত ছিয়াম শুদ্ধ হবে। কারণ রাসূল ﷺ কখনো কখনো অপবিত্র অবস্থায় ফজর করতেন। অতঃপর ছিয়াম রাখতেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) ও উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেছেন, নিজ স্ত্রীর সাথে মিলনজনিত জুনুবী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফজর হয়ে যেত। তখন তিনি গোসল করতেন এবং ছিয়াম রাখতেন' (ছহীহ বুখারী, হা/১৯২৬; তিরমিযী, হা/৭৭৯)।

প্রশ্ন (১১) : ছিয়াম অবস্থায় তরকারির স্বাদ কীভাবে ও কতটুকু নেওয়া যেতে পারে?

-শাহিদা খাতুন
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ছিয়াম অবস্থায় তরকারির স্বাদ চাখার সময় যাতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত তা না পৌঁছে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, তাহলে ছিয়াম নষ্ট হবে না। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, ঝোল বা কোনো বস্তুর স্বাদ চাখার সময় কণ্ঠনালী পর্যন্ত না পৌঁছলে কোনো ক্ষতি নেই (ইরওয়াউল গালীল, ৪/৮৬)। অন্যত্র তিনি বলেন, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ঝোল বা কোনো বস্তুর স্বাদ চেখে দেখলে ছিয়াম নষ্ট হবে না (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৯৩৬৯; ইরওয়াউল গালীল, হা/৯৩৭, ৪/৮৫)।

প্রশ্ন (১২) : ওযূ করার সময় যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে সামান্য পানি গিলে ফেলা হয় তাহলে কি ছিয়াম ভঙ্গ হবে?

-আক্বিমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ছিয়াম অবস্থায় ওযূ বা গোসল করার সময় কুলি করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। লাকীত ইবনু সাবিরা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'ভালোভাবে ওযূ কর ও আঙুলের ফাঁকা স্থানে খিলাল করো, ছিয়াম পালনকারী না হলে নাকে পূর্ণমাত্রায় পানি প্রবেশ করাও' (আবূ দাঊদ, হা/১৪২; মিশকাত, হা/৪০২)। তবে কোনো কারণবসত যদি অনিচ্ছায় নাক বা মুখের মাধ্যমে সামান্য পানি চলে যায় তাহলেও তাতে ছিয়াম হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তবে যে কাজ তোমরা ইচ্ছাকৃত করো (ইচ্ছাকৃত হলে গুনাহ এবং শাস্তি হবে)' (আল-আহযাব, ৩৩/৫)।

প্রশ্ন (১৩) : ছিয়াম পালনকারীর নাকে, কানে ও চোখে ড্রপ দিলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-আক্বিমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : না, এসব কারণে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না (ফিক্বহুস সুন্নাহ, পৃ. ৫৯৩)।

ইফতার

প্রশ্ন (১৪) : কেউ যদি বাংলাদেশে ছিয়াম ধরে এবং অন্য দেশে পৌঁছে দেখে যে তাদের ইফতারীর সময় হয়েছে তাহলে তিনি কি তাদের সময়েই ইফতার করবেন, না-কি বাংলাদেশ সময়ে ইফতার করবেন?

-আকরাম
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : যে দেশে ইফতার করবে সে দেশের সময় অনুযায়ী ইফতার করতে হবে এবং তাদের সাথে করতে হবে। কেননা সূর্যাস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করতে হবে। তিনি যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। এজন্য নিজ দেশের সময়ের অপেক্ষা করা যাবে না। উমার ইবনু খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যখন ওদিক (পূর্ব) হতে রাতের আগমন ঘটে; আর এদিক (পশ্চিম) দিক হতে দিন প্রস্থান করে এবং সূর্য অস্ত যায়, তখন ছিয়াম পালনকারী ইফতার করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১০০; মুসনাদে আহমাদ, ৩৩৮; মিশকাত, হা/১৯৮৫)। তবে ঈদ করতে গিয়ে যদি ছিয়াম ২৯টির কম হয় তাহলে পরে কোনো সময় ক্বাযা আদায় করে নিতে হবে (ফিক্বহুস সুন্নাহ, পৃ. ৫৮৮)।

প্রশ্ন (১৫) : অনেকেই দু'আ কবুলের আশায় ইফতারির পূর্ব মুহূর্তে বেশি বেশি দু'আ করে থাকেন। কেননা মহান আল্লাহ ঐ সময়ে বান্দার দু'আ কবুল করে থাকেন। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-আহমাদ
কাটাখালী, রাজশাহী।

উত্তর : 'ইফতারির পূর্ব মুহূর্তে দু'আ কবুল হয়' মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ (যঈফ ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৩)। বরং রামাযান মাসের পুরো সময়টাই দু'আ কবুলের সময়। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'রামাযান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্ট জিনদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা হয় এবং এর দরজাও তখন আর খোলা হয় না, খুলে দেওয়া হয় জান্নাতের দরজাগুলো এবং এর একটি দরজাও

তখন আর বন্ধ করা হয় না। (এ মাসে) একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেন, হে কল্যাণ অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত! বিরত হও। আর বহু লোককে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এ মাসে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক রাতেই এরূপ হতে থাকে' (তিরমিযী, হা/৬৮২, ইবনু মাজাহ, হা/১৬৪২; মিশকাত, হা/১৯৬০)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রামযান মাস উপস্থিত হলে রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৯, ৩২৭৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭৯; মিশকাত, হা/১৯৫৬)। তাই শুধু ইফতারির পূর্ব মুহূর্তে নয়, বরং রামাযান মাসের যে কোনো সময় দু'আ করলে আল্লাহ তা কবুল করবেন, ইনশা-আল্লাহ।

প্রশ্ন (১৬) : রামাযান মাসে ইফতারির পূর্বে সম্মিলিতভাবে বা একাকী হাত তুলে দু'আ করা যাবে কি?

-সাবিরুল বিন নাজমুল
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা দু'আ করার বিষয়টি প্রমাণিত হলেও ইফতারির পূর্বে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তা সুস্পষ্ট বিদআত বা সমাজে প্রচলিত নব আবিষ্কৃত আমল। দ্বিতীয়ত নির্দিষ্টভাবে ইফতারির সময় দু'আ কবুল হয় মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ (যঈফ ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৩; মিশকাত, হা/২২৪৯)। ইফতারির পূর্ব মুহূর্তে দু'আ কবুল হয়, এ কথার বিশ্বাস আল্লাহর ক্ষমাকে সংকীর্ণ করে দেয়। কেননা রামাযানের ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তি ছিয়ামরত অবস্থায় যে কোনো মুহূর্তে দু'আ করলে আল্লাহ তার দু'আ প্রতিটি মুহূর্তে কবুল করে থাকেন (ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫২)। সুতরাং কেবল ইফতারির সময়ই নয়, বরং ছিয়াম অবস্থায় যে কোনো সময় দু'আ করার বিষয়টিই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন (১৭) : একটি বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলায় থাকি, এখন আযানের সাথে সাথে ইফতার করব, না-কি দেরি করে ইফতার করব?

-হাফিজুর রহমান
সিঙ্গাপুর।

উত্তর : আযান যখনই হোক সেটা ধর্তব্য নয়। বরং সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করাই কর্তব্য। সুতরাং সূর্যাস্তের সাথে সাথে যদি আযান হয় তাহলে ইফতার করবে। দেরি করা যাবে না। কারণ দেরি করে ইফতার করা ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের কাজ। তাছাড়া সূর্য ডোবার ব্যাপারে মানুষ যখন যেখানে থাকবে, তখন সেখানকার সময়ই তার জন্য প্রযোজ্য হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক সফরে আমরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। আর তিনি ছিলেন ছওমের অবস্থায়। যখন সূর্য ডুবে গেল তখন তিনি দলের কাউকে বললেন, হে অমুক! উঠো। আমাদের জন্য ছাতুগুলো আনো। সে বলল, সন্ধ্যা হলে ভালো হতো। তিনি বললেন, নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতুগুলো প্রস্তুত করো। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সন্ধ্যা হলে ভালো হতো। তিনি বললেন, নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতুগুলো প্রস্তুত করো। সে বলল, দিন তো এখনো রয়ে গেছে। তিনি বললেন, তুমি নামো এবং আমাদের জন্য ছাতুগুলো প্রস্তুত করো। অতঃপর সে নামল এবং তাদের জন্য ছাতুগুলো আনল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন। অতঃপর বললেন, 'যখন রাত্রি এইদিক তথা পূর্বদিক হতে আগমন করবে আর দিন এইদিক তথা পশ্চিমদিক হতে প্রস্থান করবে। আর সূর্য অস্ত যাবে, তখনই ছিয়াম পালনকারী ইফতার করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৫-৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১০১)। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, একটি বহুতলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের যে যে তলাতেই থাকুক তথাকার স্থানীয় সময়ানুযায়ী ইফতার করবে।

প্রশ্ন (১৮) : আমার পিতা-মাতা মারা গেছেন। তাদের নামে ইফতার মাহফিল করা যাবে কি?

-কবীর
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : মৃত পিতা-মাতার নামে আমাদের সমাজে যে ইফতার মাহফিল ও ইফতারির ব্যবস্থা করার প্রথা চালু আছে তা শরীআতসম্মত নয়। বিধায় তা করা যাবে না। বরং মৃত পিতা-মাতার নামে টাকা-পয়সা দান করতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। আমার ধারণা যে, তিনি কথা বলার সুযোগ পেলে দান করে যেতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি, তবে কি তিনি নেকী পাবেন? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৪; মিশকাত, হা/১৯৫০)।

ছিয়ামের হুকুম

প্রশ্ন (১৯) : রাতে ঘুম ভাঙেনি এবং ছিয়াম পালনেরও নিয়্যত করতে পারেনি এ অবস্থায় সূর্য উঠে গেছে। এমতাবস্থায় করণীয় কী?

-আসাদুল্লাহ
শার্শা, যশোর।

উত্তর : এমতাবস্থায় ছিয়াম থাকতে হবে। কারণ দিনেও ছিয়ামের নিয়্যত করা যায়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাছে এসে বললেন, তোমার নিকট (খাবার) কিছু আছে কি? আমি বললাম না, কিছুই নেই। তিনি বললেন, তাহলে আমি (আজ) ছিয়াম রাখলাম (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৪; তিরমিযী, হা/৭৩৩; নাসাঈ, হা/২৩২৭; আবূ দাঊদ, হা/২৪৫৫; মিশকাত, হা/২০৭৬)। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, না খেয়েও ছিয়াম রাখা যায়।

প্রশ্ন (২০) : অসুস্থতার কারণে গত বছর সব ছিয়াম রাখতে পারিনি। বর্তমানেও শারীরিকভাবে অসুস্থ। এখন করণীয় কী?

-মনিরুল ইসলাম
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : ছিয়াম রাখা প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির উপর ফরয। কিন্তু রামাযান মাসে কেউ অসুস্থ থাকলে অন্য কোনো সময়ে তা ক্বাযা করে নিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা সফরে রয়েছে, সে যেন অন্য সময়ে তা ক্বাযা করে নেয়' (আল-বাক্বারা, ২/১৮৪)। কিন্তু রোগ ভালো হওয়ার কোনো লক্ষণ না থাকলে ফক্বীর-মিসকীনদেরকে প্রতিদিন সমান অর্ধ ছা' খাবার ফিদইয়াস্বরূপ দিতে হবে (আল-বাক্বারা, ২/১৮৪)।

প্রশ্ন (২১) : সফর অবস্থায় ছিয়াম পালনের বিধান কী? মুসাফির যদি ছিয়াম রাখে তাহলে কি কোনো ক্ষতি আছে?

-আক্বিমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : সফর অবস্থায় ছিয়াম রাখতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে ছাড়তেও পারে। হামযা ইবনু আমর আল-আসলামী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সফরের অবস্থায় ছিয়াম পালনের ক্ষমতা আমার রয়েছে। এ সময় ছিয়াম পালন করলে আমার কোনো গুনাহ হবে কি? তিনি বললেন, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ অবকাশ, যে তা গ্রহণ করবে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি কেউ ছিয়াম পালন করতে চায়, তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। অপর বর্ণনায় তিনি আরো বলেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে ছওম পালন করো, আর যদি ইচ্ছা হয় তবে ছওম ছেড়ে দাও (ছহীহ মুসলিম, হা/১১২১)। ।

প্রশ্ন (২২) : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদের ছিয়ামের হুকুম কী?

-সিয়াম
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলারা ছিয়াম রাখতে সক্ষম না হলে পরবর্তীতে তাদেরকে তার ক্বাযা আদায় করতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ তাদেরকে অন্য সময় আদায় করার জন্য আদেশ করেছেন (আল-বাক্বারা, ২/১৮৫; ফিক্বহুস সুন্নাহ, পৃ. ৫৯০)। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা মুসাফিরকে ছিয়াম পালনের ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন এবং ছালাত অর্ধেক করে দিয়েছেন। আর গর্ভবতী ও বাচ্চাকে দুধপানকারিণী মহিলাকে ছিয়াম পালন করার ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন' (নাসাঈ, হা/২২৭৪, ২২৭৫)। তবে ক্বাযা আদায় করতে সক্ষম না হলে ফিদইয়া দিবে এবং প্রতিদিন সমান ফিদইয়াস্বরূপ একজন মিসকীনকে সোয়া কেজি চাল দিবে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, গর্ভবতী ও দুগ্ধ প্রদানকারিণী মহিলার জন্যে ফিদইয়া প্রদানের বিধান বহাল রয়েছে (আবূ দাঊদ, হা/২৩১৭)।

ক্বাযা ছিয়াম

প্রশ্ন (২৩) : বর্তমানে যখন রামাযান মাস হচ্ছে, তখন ধান কাটার পূর্ণ মৌসুম। বিধায় অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে ছিয়াম রাখা সম্ভব না হলে পরবর্তীতে তার ক্বাযা আদায় করা যাবে কি?

-রাফিউল ইসলাম
নিতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : যেসব কারণে ছিয়াম ছেড়ে দেওয়া বা ক্বাযা করা যায় তা হচ্ছে, ১. সফর অবস্থায় মুসাফির ব্যক্তি ২. বিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাযুক্ত ব্যক্তি ৩. ঐ গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারিণী নারী যিনি ছিয়াম রাখলে সন্তান বা তার নিজ জীবনের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে ৪. হায়েয ও নেফাস হয়েছে এমন নারী (আল-বাক্বারা, ২/১৮৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৬৬৭)। এই শ্রেণির ব্যক্তিরা ব্যতীত কারো জন্য ছিয়াম ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে কুরআন-হাদীছ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কোনো দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষুধায় মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমন পরিস্থিতিতে ছিয়াম ছেড়ে দিতে পারে (আল-মায়েদা, ৫/৩)।

প্রশ্ন (২৪) : স্বামী অসুস্থতার কারণে রামাযান মাসে ছিয়াম রাখতে পারেনি। এমতাবস্থায় মারা গেছে। স্ত্রী কি তার পক্ষ থেকে ছিয়াম আদায় করতে পারে?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : না, এমতাবস্থায় স্ত্রীকে ছিয়াম রাখতে হবে না। বরং তার পক্ষ থেকে ছিয়ামের কাফফারা দিবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা সামর্থ্যবান (কিন্তু ছিয়াম পালনে অক্ষম) তারা এর পরিবর্তে ফিদইয়া হিসাবে একজন মিসকীনকে খাদ্য দিবে' (আল-বাক্বারা, ২/১৮৪)। উল্লেখ্য যে, ছিয়ামের ক্বাযা যিম্মায় রেখে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে ছিয়াম আদায় করবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি নযর তথা মানতের ছিয়ামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (আবূ দাঊদ, হা/২৪০০)।

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ

প্রশ্ন (২৫) : কথিত আছে যে, উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ২০ রাকআত তারাবীহ চালু করেছিলেন এবং মক্কা ও মদীনায় এখনোও তা চালু আছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাবেন।

-নাহার
লালপুর, নাটোর।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনে কখনো ২০ রাকআত তারাবীহ পড়েননি এবং কাউকে পড়ার নির্দেশও দেননি। অনুরূপ উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও ২০ রাকআত তারাবীহ পড়েননি এবং কাউকে পড়ার নির্দেশও দেননি বরং ১১ রাকআত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন (মুওয়াত্ত্বা মালেক; হা/৩৮০; মিশকাত, হা/১৩০২)। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর যামানায় ২০ রাকআত তারাবীহ পড়া হতো বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা নিতান্তই যঈফ এবং ২০ রাকআত তারাবীহ সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে 'মারফূ' সূত্রে যে বর্ণনা এসেছে তা মাওযূ বা জাল (আলবানী, হাশিয়া মিশকাত, হা/১৩০২, ১/৪০৮; ইরওয়া, ২/১৯৩, হা/৪৪৬ ও ৪৪৫-এর ব্যাখ্যা দ্র.)। এতদ্ব্যতীত ২০ রাকআত তারাবীহ সম্পর্কে আরো যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে, তার সবগুলোই জাল কিংবা যঈফ (মিরআত, ২/২২৯, ২৩৩, হা/১৩০৮ ও ১৩১২)। উল্লেখ্য যে, সাঊদী আরবের প্রায় সব মসজিদেই ১১ রাকআত তারাবীহ পড়া হয়। মক্কা ও মদীনায় দুই ইমামের মাধ্যমে ২০ রাকআত পড়ানো হয়। এটা সরকারি ব্যাপার হতে পারে। মক্কা ও মদীনার আমল কোনো শারঈ বিধান নয়।

প্রশ্ন (২৬) : তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়কারীদের জন্য রামাযান মাসে কোনটি উত্তম, তারাবীহ না-কি তাহাজ্জুদ?

-আব্দুল কাদের
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়কারীদের জন্য রামাযান মাসে তাহাজ্জুদ পড়াই উত্তম। যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনে, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'হে লোক সকল! তোমার নিজেদের বাড়িতে ছালাত আদায় করো। এজন্য ফরয ছালাত ব্যতীত যে ছালাত ঘরে পড়া হয় তা উত্তম ছালাত' (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৯০; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৮১)।

প্রশ্ন (২৭) : রামাযান মাসে আট রাকআত তারাবীহ ও এক রাকআত বিতর পড়া যাবে কি?

-তামান্না তাবাসসুম
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : হ্যাঁ, পড়া যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'রাতের ছালাত দুই দুই রাকআত করে। অতঃপর যখন তুমি ছালাত শেষ করতে চাইবে, তখন এক রাকআত আদায় করে নিবে। তা তোমার পূর্ববর্তী ছালাতকে বিতর করে দিবে (ছহীহ বুখারী, হা/৯৯৩)। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রাতের (নফল) ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'রাতের ছালাত দুই দুই রাকআত করে আদায় করবে। তবে ভোর হয়ে আসছে দেখলে এক রাকআত বিতর আদায় করে নিবে (ছহীহ বুখারী, হা/১১৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৪৯)। তবে, আট রাকআত তারাবীহ ও তিন রাকআত বিতর পড়াই বেশি ভালো (ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৩৮)।

প্রশ্ন (২৮) : এশার ছালাতের পরপরই তারাবীহর ছালাত শুরু করা যাবে কি?

-আব্দুছ ছাত্তার
মহব্বতপুর, রাজশাহী।

উত্তর : রাতের ছালাত বা তাহাজ্জুদ ছালাতের সময় শুরু হয় এশার ছালাতের পরেই। অতএব কোনো মসজিদে এশার ছালাত আদায় হয়ে গেলে রাতের ছালাত তথা তাহাজ্জুদ বা তারাবীহর ছালাত শুরু করতে পারে। তাতে কোনো বাধা-নিষেধ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে তিন দিন জামাআতে তারাবীহর ছালাত আদায় করেছিলেন, তার শুরুটা ছিল এশার ছালাতের পর থেকে (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬৩৫০, ৬/২৬৭, সনদ ছহীহ)। জাবের ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের কেউ যদি শেষ রাতে জাগতে পারবে না বলে আশঙ্কা করে, তাহলে বিতর ছালাত আদায় করে ঘুমাবে। আর যার শেষ রাতে জাগতে পারার আত্মবিশ্বাস বা নিশ্চয়তা আছে, সে শেষ রাতে বিতর আদায় করবে। কেননা শেষ রাতের কুরআন পাঠে মালায়িকাহ উপস্থিত থাকে। আর এটা সর্বাপেক্ষা উত্তমও বটে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৫৫)।

প্রশ্ন (২৯) : তারাবীহর ছালাতের প্রত্যেক শুরুর রাকআতে ছানা পড়তে হবে কি?

-আব্দুর রহমান
মনিরামপুর, যশোর।

উত্তর : জানাযার ছালাত ব্যতীত সকল ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া সুন্নাত। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন বলতেন, 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা'। অর্থ : আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনার প্রশংসা করছি। আপনার নাম বরকতময়। আপনার মর্যাদা সমুন্নত। আপনি ছাড়া কোনো প্রকৃত উপাস্য নাই (আবূ দাঊদ, হা/৭৭৬; নাসাঈ, হা/৮৯৯; মিশকাত, হা/৮১৫)। কাজেই তারাবীহর ছালাতের প্রত্যেক শুরুর রাকআতে ছানা পড়তে হবে (ফাতাওয়া ইসলামীয়্যাহ, ১/৪৪৯)।

প্রশ্ন (৩০) : বাড়িতে মহিলাদের তারাবীহর জামাআতে পুরুষ ব্যক্তি ইমামতি করতে পারবে কি?

-সাবিরুল বিন নাজমুল
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : মহিলারা বাড়িতে হোক চাই মসজিদে হোক তারাবীহসহ যেকোনো ছালাত পুরুষ ব্যক্তির ইমামতিতে আদায় করতে পারে। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও জনৈক ইয়াতীম আমাদের ঘরে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে ছালাত আদায় করছিলাম। আর উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) আমাদের পেছনে ছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৯; মিশকাত, হা/১১০৮)। উল্লেখ্য যে, মহিলাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মসজিদের চেয়ে বাড়িতে আদায় করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না। আর তাদের বাড়ি তাদের জন্য উত্তম' (আবুদাঊদ, হা/৫৬৭; মিশকাত, হা/১০৬২)।

প্রশ্ন (৩১) : রামাযান মাসে মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম করা যাবে কি?

-নাজমা খাতুন
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : রামাযান মাসে কিংবা অন্য যেকোনো সময়ে মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযামদের থেকে কোনো প্রমাণ শরীআতে নেই। অতএব মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন তেলাওয়াত করে তার কাছে নেকী পৌঁছানোর বিষয়টি স্পষ্ট বিদআত। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার ব্যাপারে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮; মিশকাত, হা/১৪০)।

তবে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা ও দান করা যায়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। আমার ধারণা যে, তিনি কথা বলার সুযোগ পেলে দান করে যেতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি, তবে কি তিনি নেকী পাবেন? নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৪; মিশকাত, হা/১৯৫০)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মানুষ মারা গেলে তার আমল (আমলের ছওয়াব) বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি উৎস থেকে সে ছওয়াব পেতে থাকে। ১. চলমান ছাদাক্বা, ২. উপকারী বিদ্যা, ৩. নেক সন্তানের দু'আ' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১; আবূ দাঊদ, হা/২৮৮০; তিরমিযী, হা/১৩৭৬)।

লায়লাতুল ক্বদর

প্রশ্ন (৩২) : নির্ধারিতভাবে ২৭শে রামাযানের রাত্রিতে লায়লাতুল ক্বদর উদযাপন করা যাবে কি?

-মাহমূদ
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : প্রথমত, আনুষ্ঠানিকভাবে বক্তব্যের মাধ্যমে এবং খানা-পিনার মাধ্যমে লায়লাতুল ক্বদর উদযাপন করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, ২৭শে রামাযানের রাত্রিকে নির্ধারণ করে ইবাদত করা যাবে না। কেননা রামাযানের শেষের দশকের ব্যাপারে যেমন হাদীছ এসেছে তেমনি শেষ পাঁচ বিজোড় রাতের ব্যাপারেও হাদীছ এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একাধিক হাদীছে বলেছেন, اِلْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِىْ كُلِّ وِتْرٍ 'তোমরা রামাযানের শেষ দশকের প্রত্যেক বেজোড় রাত্রিতে ক্বদর রাত্রি তালাশ করো' (তিরমিযী, হা/৭৯২, সনদ ছহীহ)। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ছাহাবায়ে কেরাম কোনো রাতকে নির্ধারণ করে লায়লাতুল ক্বদর উদযাপন করেননি। বরং লায়লাতুল ক্বদরকে খাছ করে ইবাদত করা আল্লাহর রহমতকে খাটো করার শামিল। উল্লেখ্য, ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত যে হাদীছে ২৭ রামাযানের কথা এসেছে, তা একজন ছাহাবীর দাবী ও বিশ্লেষণ (ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৬, ১১৬৯; মিশকাত, হা/২০৮৮)। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত একাধিক স্পষ্ট হাদীছের প্রতি আমল করা কর্তব্য, যেগুলোতে কেবল বেজোড় রাত্রির কথা এসেছে।

প্রশ্ন (৩৩) : লায়লাতুল ক্বদরে সারা রাত জেগে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-শহিদুল ইসলাম
চকবাজার, ঢাকা।

উত্তর : রাতের ছালাত ১১ রাকআতের বেশি আদায় করা যাবে না (ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৭)। এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দীর্ঘ ক্বিরাআতে ছালাত আদায় এবং তেলাওয়াত ও তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে সারা রাত (সাহারী পর্যন্ত) ছালাত আদায় করা যায়। আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করতাম। তিনি এ মাসের (প্রথম দিকের অধিকাংশ দিনই) আমাদেরকে নিয়ে (তারাবীহ) ছালাত আদায় করেননি। অতঃপর রামাযানের সাত দিন বাকী থাকতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ছালাত আদায় করলেন। তিনি পরবর্তী রাতে আমাদেরকে নিয়ে (মসজিদে) ছালাত আদায় করলেন না। অতঃপর পঞ্চম রাতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে ছালাতে দাঁড়িয়ে অর্ধেক রাত অতিবাহিত করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি আপনি পুরো রাত আমাদেরকে নিয়ে ছালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি ইমামের সাথে (এশার) ছালাত আদায় করে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে পুরো রাতের ছালাত আদায়কারী হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি বলেন, অতঃপর চতুর্থ রাতে তিনি (মসজিদে) ছালাত আদায় করেননি। যখন তৃতীয় রাত এলো তিনি তার পরিবার-পরিজন, স্ত্রী ও অন্য লোকদের একত্রিত করলেন এবং আমাদেরকে নিয়ে এত দীর্ঘক্ষণ ছালাত আদায় করলেন যে, আমরা 'ফালাহ' ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করলাম। জুবাইর ইবনু নুফাইর বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ফালাহ' কী? তিনি বললেন, সাহারী খাওয়া। অতঃপর তিনি এ মাসের অবশিষ্ট রাতে আমাদেরকে নিয়ে ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াননি (আবূ দাঊদ, হা/১৩৭৫)। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, রামাযান মাসে সারা রাত ইবাদত করা যায়। কেননা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর হাদীছ অনুরূপই প্রমাণ করে। যেখানে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রামাযানের রাতের ছালাত আদায়ের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি রামাযান মাসে এবং রামাযানের বাইরে ১১ রাকআতের বেশি ছালাত আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে (২+২) চার রাকআত পড়তেন। তুমি (আবূ সালামা) তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাকআত পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি তিন রাকআত (বিতর) পড়তেন (ছহীহ বুখারী হা/২০১৩; ছহীহ মুসলিম হা/৭১৮; ফাতহুল বারী, ৪/৩১৮)।

প্রশ্ন (৩৪) : পশ্চিমের দেশগুলোতে আগে ও পূর্বের দেশগুলোতে পরে এমনভাবে চাঁদ উঠে যে, তাতে উভয় অঞ্চলে রামাযানের মাঝে দু-একদিন আগে-পিছে থাকে। এমতাবস্থায় উভয় অঞ্চলে একই রাত্রিতে কীভাবে লায়লাতুল ক্বদর পাওয়া সম্ভব?

-মুহাম্মাদ আফজাল
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : ক্বদরের রাত্রিটি পৃথিবীর যখন যে স্থান দিয়ে চলে তখন সেখানেই 'লায়লাতুল ক্বদর' ঘটে। এটিকে নিজের হিসাবে রাখা ঠিক নয়। কেননা মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির যেমন সীমা রয়েছে তেমনি মানুষের চিন্তাশক্তির সীমা রয়েছে। আর গায়েবের এই বিষয়গুলো মানুষের চিন্তাশক্তির বাইরে। এটি মহান আল্লাহ তাআলা নিজেই পরিচালনা করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লায়লাতুল ক্বদর রামাযানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিগুলোতে অন্বেষণ করতে বলেছেন। তাছাড়া কোন তারিখে লায়লাতুল ক্বদর হবে সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট করে কিছু বলে যাননি। বরং তিনি একাধিক হাদীছে বলেছেন, 'তোমরা রামাযানের শেষ দশকের প্রত্যেক বেজোড় রাত্রিতে ক্বদর রাত্রি তালাশ করো' (ছহীহ বুখারী, হা/২০১৭; মিশকাত, হা/২০৮৩)। সুতরাং এই শেষ দশকে অন্বেষণ করলেই আশা করা যায় লায়লাতুল ক্বদর পেয়ে যাবে। আর মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ই'তিকাফ

প্রশ্ন (৩৫) : ই'তিকাফকারী যে মসজিদে আছেন তিনি কি অন্য মসজিদে গিয়ে তারাবীহর ছালাত পড়াতে পারেন?

-কামালউদ্দীন
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : ই'তিকাফকারী অন্য মসজিদে গিয়ে কোনো ছালাতের ইমামতি করতে পারবে না। কেননা ই'তিকাফ অবস্থায় পেশাব-পায়খানা ও জরুরী কাজ ছাড়া মসজিদ হতে বের হওয়া নিষেধ। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো, সে কোনো রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সহবাস করবে না এবং অধিক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, ছিয়াম না রেখে ই'তিকাফ করবে না এবং জামে মসজিদে ই'তিকাফ করবে (আবূদাঊদ, হা/২৪৭৩, সনদ হাসান ছহীহ; মিশকাত, হা/২১০৬)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফ অবস্থায় পারিবারিক প্রয়োজনে স্ত্রীদের নিকট যেতেন না। বরং স্ত্রীরাই তার নিকট আসতেন (ছহীহ বুখারী, হা/২০৩৮)।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৩৬) : ই'তিকাফ চলাকালীন হায়েয শুরু হলে করণীয় কী?

-উম্মে আব্দুল্লাহ
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : এমতাবস্থায় ই'তিকাফসহ ছালাত, ছিয়াম সবকিছুই ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে শুধু অবশিষ্ট ছিয়ামগুলোর ক্বাযা আদায় করবে। জনৈক মহিলা আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা ঋতুবতী হলে নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে ছিয়ামের ক্বাযা আদায়ের আদেশ করতেন। কিন্তু ছালাতের ক্বাযা আদায়ের আদেশ করেননি (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫; আবূ দাঊদ, হা/২৬৩; ইরওয়াউল গালীল, হা/২০০; মিশকাত, হা/২০৩২)।

প্রশ্ন (৩৭) : ই'তিকাফে বসার সময় কখন? মহিলারা কি বাড়িতে ই'তিকাফ করতে পারে?

-মাহমূদা খাতুন
কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ২০ রামাযান অতিবাহিত হওয়ার পর মাগরিবের পর ই'তিকাফে প্রবেশ করবে। কারণ শেষ দশক আরম্ভ হয় ২০ রামাযানের সূর্য ডুবার পর হতে (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭২; ফাতাওয়া ইবনু উছায়মীন, ২০/১২০)। আর ২১ তারিখ ফজর পর হতে ই'তিকাফকারী সম্পূর্ণ একাকী ইবাদতে মশগূল থাকবে (ছহীহ মুসলিম, মিশকাত, হা/২১০৪; ফাতাওয়া ইবনু উছায়মীন, ২০/১৭০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

মহিলারা বাড়িতে ই'তিকাফ করতে পারবে না। বরং মহিলা-পুরুষ সবাইকেই মসজিদে ই'তিকাফ করতে হবে (আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)। উল্লেখ্য যে, মহিলারা মসজিদে ই'তিকাফ করতে চাইলে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি থাকতে হবে এবং মসজিদে পর্দার ব্যবস্থা ও ফিতনার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ইন্তেকাল করলেন, তারপর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/২০২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭২; মিশকাত, হা/২০৯৭)। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, মহিলারা ই'তিকাফ করতে চাইলে জুমআ মসজিদেই করবে। আর যদি মসজিদে করা সম্ভব না হয় তাহলে ই'তিকাফ করতে হবে না।

ফিতরা ও যাকাত

প্রশ্ন (৩৮) : আমাদের সমাজে ঈদের পূর্বের দিন সন্ধ্যায় ফিতরার চাল হক্বদারদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। এভাবে ফিতরার চাল ঈদের ছালাতের পূর্বে বণ্টন করা যাবে কি?

-রিয়াযুল ইসলাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ছাদাক্বাতুল ফিতর ঈদের পূর্বে জমা করতে হবে এবং ঈদের ছালাতের পরে তা বণ্টন করতে হবে। এটাই সুন্নাতী ত্বরীক্বা (বিস্তারিত দ্র. ফাৎহুল বারী, হা/১৫১১ 'যাকাত' অধ্যায়, ৭৭ অনুচ্ছেদ, ৩/৪৩৯-৪০)। ছহীহ বুখারীতে নাফে'-এর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে ঈদের ছালাতের পূর্বে ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করার কথা এসেছে (ছহীহ বুখারী, হা/১৫১১ 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৭৭)। কিন্তু পরবর্তী অনুচ্ছেদে নাফে' (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে ছাদাক্বাতুল ফিতর সংক্রান্ত আরেকটি হাদীছ বর্ণনার পর বলেন, وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبِلُوْنَهَا 'ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) ছাদাক্বাতুল ফিতর জমাকারীদের নিকট ফিতরা প্রদান করতেন' (ঐ, হা/১৫১২; ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী, ৩/৪৭৯)। ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, كَانُوْا يُعْطُوْنَ لِلْجَمْعِ لاَ لِلْفُقَرَاءِ 'তাঁরা জমা করার জন্য দিতেন, ফক্বীরদের জন্য নয়'। ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে আব্দুল ওয়ারেছের সূত্রে আইয়ূব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) ছাদাক্বাতুল ফিতর কখন প্রদান করতেন? তিনি বললেন, আদায়কারী বসলে। তিনি আবার বললেন, আদায়কারী কখন বসতেন? তিনি বললেন, ঈদের ছালাতের একদিন বা দু'দিন পূর্বে (ফাতহুল বারী, ৩/৪৮০)। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) নাফে' (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِيْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ 'আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) ঈদুল ফিতরের দু'দিন বা তিন দিন পূর্বে যাদের নিকট ছাদাক্বাতুল ফিতর জমা করা হয় তাদের নিকট ফিতরা প্রেরণ করতেন' (মুওয়াত্ত্বা মালেক, ১/২৮৫)। 'যাকাত' অধ্যায় 'যাকাতুল ফিতর প্রেরণ' অনুচ্ছেদ)। তেমনি আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ 'রাসূলুল্লাহ আমাকে রামাযানের যাকাত রক্ষার বা হেফাযতের দায়িত্ব প্রদান করেন' (ফাতহুল বারী, ৩/৪৮০। যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি জমাকৃত ছাদাক্বাতুল ফিতর পাহারা দিচ্ছিলেন। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, ঈদের পূর্বে ছাদাক্বাতুল ফিতর জমা করা সুন্নাত। তাছাড়া ইবনু উমার

রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ঈদের ছালাতের পূর্বে ছাদাক্বাতুল ফিতর বের করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তা ছালাতের পূর্বে বের করতাম এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছালাত শেষে তা বণ্টন করতেন' (ইরওয়াউল গালীল, ৩/৩৩২-৩৩)। উল্লেখ্য যে, ঈদের ছালাতের পূর্বে ফিতরা বণ্টনের যে বর্ণনাগুলো এসেছে তা যঈফ (ইরওয়াউল গালীল, হা/৮৪৪-৮৪৫, ৩/৩৩২-৩৩৪)।

প্রশ্ন (৩৯) : আমি বিদেশে থাকি। এমতাবস্থায় দেশে যাকাতুল ফিতর আদায় করলে কী পরিমাণ আদায় করতে হবে?

-হাফিজুর রহমান
সিঙ্গাপুর প্রবাসী।

উত্তর : প্রবাসী অবস্থায় দেশে ফিতরা আদায় করতে চাইলে এবং নির্ধারিত সময় ফিতরা আদায় করা সম্ভব হলে স্থানীয় খাদ্য-দ্রব্য বা শস্য (চাল, গম, খেজুর ইত্যাদি) এক ছা' বা আড়াই কেজি বা এর কাছাকাছি পরিমাণ আদায় করে দিবে। কেননা এটাই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমরা এক ছা' শস্য ফিতরা আদায় করবো, যা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আদায় করতাম (ইবনু মাজাহ, হা/১৮২৯)।

প্রশ্ন (৪০) : টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়া যাবে কি?

-আহমাদ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা যাবে না। বরং খাদ্যদ্রব্য দিয়েই ফিতরা আদায় করতে হবে। কেননা ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুদ্রার প্রচলন ছিল। তবুও তিনি ফিতরা হিসাবে মুদ্রা প্রদানের কথা বলেননি বরং খাদ্যশস্যের কথা বলেছেন। আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঈদুল ফিতরের পূর্বে এক ছা' খাদ্য ফিতরা দিতাম। তখন আমাদের খাদ্য ছিল ঘি, কিশমিশ, পনীর ও খেজুর (ছহীহ বুখারী, হা/১৫১০)। সুতরাং খাদ্যশস্য দ্বারাই ফিতরা আদায় করতে হবে। এছাড়াও ছাহাবী, তাবেঈ থেকে টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

প্রশ্ন (৪১) : অন্য মাসের চেয়ে রামাযান মাসে যাকাত বের করার কোনো গুরুত্ব ও ফযীলত আছে কি?

-তানজিম খাতুন
রুপসা, খুলনা।

উত্তর : যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে রামাযান মাসকে প্রাধান্য না দিয়ে নির্ধারিত সময়ে যাকাত দেওয়াই শারঈ বিধান। আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমার কাছে ২০০ দিরহাম থাকলে এবং তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে পাঁচ দিরহাম (যাকাত) দিবে। স্বর্ণের ক্ষেত্রে ২০ দীনারের কমে যাকাত নেই। ২০ দীনারে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে। এরপর যা বাড়বে তাতে উপরিউক্ত হিসাবে যাকাত দিতে হবে' (আবূ দাউদ, হা/১৫৭৩; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৯৯)। সুতরাং প্রত্যেক যাকাত প্রদানকারীর জন্য জরুরী হলো, যখন তার সম্পদের নিছাব পূর্ণ হওয়ার পর এক বছর অতিবাহিত হবে তখনই সে যাকাত আদায় করবে। যদি তার বছর রজব মাসে শেষ হয় তাহলে সে রজব মাসে যাকাত আদায় করবে। অনুরূপভাবে যে মাসে তার বছর পূর্ণ হবে সে মাসেই তাকে যাকাত আদায় করতে হবে। শুধু রামাযান মাসে যাকাত আদায় করব এমন নিয়্যতে বিলম্ব করা মোটেও উচিত নয়। যাকাত যেহেতু গরীবের হক্ব, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার হক্ব তার নিকটে পৌঁছে দেয়া জরুরী। যদি মানুষের উপর যাকাত ফরয হওয়ার সাথে সাথে তারা তা আদায় করে তাহলে পুরা বছর গরীব-মিসকীনদের জীবিকা নির্বাহ সুবিধাজনক হবে (মাজমূঊ ফাতাওয়া ইবনু উছায়মীন, ১৮/১৯১)।

প্রশ্ন (৪২) : যদি কোনো শিশু রামাযান মাসের শেষ দিন অথবা ঈদের দিন সকালে জন্মগ্রহণ করে, তবে কি তার ফিতরা দিতে হবে?

-মাহমূদ হাসান
সাঘাটা, বগুড়া

উত্তর : কোনো শিশু যদি রামাযান মাসের শেষ দিনে অথবা ঈদের দিন সূর্য উঠার পূর্বে অথবা ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে জন্মগ্রহণ করে, তাহলে তার ফিতরা দিতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলিম দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি, নর-নারী ছোট-বড় সকল এর উপর 'এক ছা'' খেজুর বা 'এক ছা' যব' ফরয করেছেন। তিনি লোকদের ঈদের ছালাতে যাওয়ার পূর্বেই তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৩-৫; মিশকাত, হা/১৮১৫-১৮১৬)। উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কোনো শিশু যদি ঈদের ছালাতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করে তার উপরও ফিতরা দেওয়া ফরয, যা তার অভিভাবক আদায় করবে।

ঈদগাহ, ঈদ ও ঈদের ছালাত

প্রশ্ন (৪৩) : ঈদগাহে ত্রিপল বা শামিয়ানা টাঙানো যাবে কি?

-মুহাম্মাদ
চাটমোহর, পাবনা।

উত্তর : ঈদের ছালাত ফাঁকা জায়গায় ও উন্মুক্ত স্থানে আদায় করাই সুন্নাত। কেননা মসজিদে নববীর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান

www.al-itisam.com

যেখানে ছালাত আদায় করলে অন্য মসজিদের চেয়ে এক হাজার গুণ নেকী বেশি হয়। তারপরেও তিনি সেখানে ছালাত আদায় না করে প্রায় ৫০০ গজ দূরে গিয়ে খোলা ময়দানে উন্মুক্ত স্থানে ছালাত আদায় করেন (ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬)। এসব হাদীছ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, রোদ-বৃষ্টির কারণে ত্রিপাল বা শামিয়ানা ঈদের মাঠে টাঙানো যাবে না। এটি একটি নব আবিষ্কৃত বিষয় বা বিদআত (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮; মিশকাত, হা/১৪০)।

প্রশ্ন (৪৪) : ঈদের ছালাত আদায়ের পূর্বে কোনো বক্তব্য দেওয়া যাবে কি?

-আকীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : না, ঈদের ছালাতের পূর্বে কোনো বক্তব্য দেওয়া যাবে না। এমনকি কোনো ক্বিরাআত, গযল, সঙ্গীত কিছুই বলা যাবে না। বরং প্রথমে ছালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর খুৎবা দিতে হবে। আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে বের হতেন এবং সেখানে প্রথমে যা করতেন তা হলো ছালাত। অতঃপর ফিরে জনতার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন আর জনতা তখন নিজেদের কাতারে বসা থাকত। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন, নছীহত করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। আর যদি কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করতেন তাদেরকে বাছাই করতেন অথবা যদি কাউকে কোনো নির্দেশ দেওয়ার থাকত, নির্দেশ দিতেন। অতঃপর বাড়ি ফিরতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯৪; মিশকাত, হা/১৪২৬)। উল্লেখ্য যে, ঈদের ছালাতের পূর্বে খুৎবা দেওয়ার প্রচলন শুরু করেন মারওয়ান ইবনু হাকাম (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯)। অথচ প্রখ্যাত ছাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার সেই কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৫৬)। সুতরাং খুৎবার পূর্বেই ঈদায়নের ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (৪৫) : মহিলাদের জন্য কি ঈদের মাঠে যাওয়া জরুরী?

-কাওছার
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মহিলাদের জন্যও ঈদের মাঠে যাওয়া জরুরী। কেননা তাদেরকে ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরালোভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি ঈদের দিনে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছালাতে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, তিনি খুৎবার পূর্বে ছালাত আরম্ভ করলেন আযান ও ইক্বামত ছাড়া এবং যখন ছালাত শেষ করলেন বেলালের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহর মহিমা ও তাঁর প্রশস্তি বর্ণনা করলেন। তৎপর লোকদেরকে উপদেশ দিলেন। তাদেরকে (পরকালের কথা) স্মরণ করালেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর মহিলাদের দিকে অগ্রসর হলেন আর তখন তাঁর সাথে ছিলেন বেলাল, তাদেরকে তিনি আল্লাহভীতির উপদেশ দিলেন। কিছু নছীহত করলেন এবং (আখেরাতের কথা) স্মরণ করালেন (ছহীহ নাসাঈ, হা/১৫৭৫; ইবনু খুযায়মা, হা/১৪৬০; মিশকাত, হা/১৪৪৬)। উম্মে আতিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমাদের নির্দেশ দেওয়া হলো, আমরা যেন ঋতুবতী ও পর্দানশিন মহিলাদেরও দুই ঈদের দিনে (ঈদগাহে) বের করি, যাতে তারা মুসলিমদের জামাআতে এবং তাদের দু'আয় শামিল হতে পারে; কিন্তু ঋতুবতীগণ যেন তাদের ছালাতের স্থান হতে একদিকে সরে বসে। তখন এক মহিলা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের কারও (শরীর ঢাকবার) বড় চাদর নেই। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার সাথী তাকে আপন চাদর পরাবে (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০; মিশকাত, হা/১৪৩১)। এই হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলারা ঈদের মাঠে গিয়েই ঈদের ছালাতে অংশগ্রহণ করবে এবং ঋতুবতী মহিলাগণ ছালাত আদায় করবে না। বরং খুৎবা ও তাকবীরে শরীক হবে। তবে সমস্য থাকলে বাড়িতে একাকী কিংবা একজন পুরুষ ইমামের ইমামতিতে ঈদের ছালাত পড়ে নিবে (ছহীহ বুখারী, 'কারো ঈদের ছালাত ছুটে গেলে সে দু'রাকআত ছালাত আদায় করবে, অনুরূপ মহিলারাও এবং যারা বাড়িতে কিংবা গ্রামে থাকে' অনুচ্ছেদ-২৫; 'ঈদায়েন' অধ্যায়-১৩)। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদে পুরুষের ইমামতিতে মেয়েদের ঈদের ছালাত পড়ার কোনো বিধান শরীআতে নেই।

প্রশ্ন (৪৬) : মহিলা ইমামের পিছনে মহিলারা ঈদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-নাজনীন
আক্কেলপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : না, মহিলার ইমামতিতে ঈদ ও জুমআর ছালাত আদায় করা যাবে না। কারণ ঈদের ছালাতে খুৎবা আছে। আর মহিলাদের জন্য খুৎবা দেওয়া জায়েয নয়। শরীআতে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কেউ এমন কোন আমল করল, যার ব্যাপারে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (৪৭) : ঈদের ছালাতের পৃথক কোনো ফযীলত আছে কি?

-নাঈম ইসলাম
দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : নির্দিষ্টভাবে ঈদের ছালাতের ফযীলত সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ঈদের ছালাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের ছালাতে সকলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাকীদ দিয়েছেন। এমনকি ঋতুবতী মহিলাদেরকেও ঈদের ছালাতের জন্য বের হতে বলা হয়েছে। পরনের চাদর না থাকলে অন্যের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে হলেও যাওয়ার কথা বলা হয়েছে (ছহীহ বুখারী, হা/৯৭৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০)। আর মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ বাস্তবায়নের ফযীলত অপরিসীম।

প্রশ্ন (৪৮) : জুমআর দিন ঈদ হলে স্বেচ্ছায় জুমআর ছালাত আদায় না করলে পাপ হবে কি?

-ছাদিকুল ইসলাম
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : না, এতে কোনো পাপ হবে না। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমআর দিন ঈদ হলে জুমআর ছালাত আদায় করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন। কেউ চাইলে তা আদায় করতে পারে। আবার নাও করতে পারে। আইয়াস ইবনে আবু রামলা আশ-শামী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মুআবিয়া ইবনু আবূ সুফিয়ান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) যায়েদ ইবনু আরকাম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে কিছু জিজ্ঞেস করার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি (মুআবিয়া) বলেন, আপনি কি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে তার সাথে ঈদ ও জুমআ একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে দেখেছেন? তিনি (যায়েদ ইবনু আরকাম) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা আদায় করেছিলেন? তিনি বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথমে ঈদের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর জুমআর ছালাত আদায়ের ব্যাপারে অবকাশ প্রদান করে বলেন, 'যে ব্যক্তি তা আদায় করতে চায়, সে তা আদায় করতে পারে' (আবূ দাঊদ, হা/১০৭০)। তবে যে ব্যক্তি জুমআ পরিত্যাগ করবে তার ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত লক্ষণীয়। (ক) সে যেন ঈদের ছালাত আদায় করে, যদি ঈদের ছালাত আদায় না করে, তাহলে অবশ্যই তাকে জুমআর ছালাত আদায় করতে হবে। (খ) জুমআর ছালাত মাফ হলেও বাসায় যোহরের ছালাত আদায় করতে হবে। (গ) মসজিদগুলোতে জুমআ অনুষ্ঠিত হতে হবে। ইমাম সাহেব খুৎবা দিবেন এবং ছালাত পড়াবেন। মানুষদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা উপস্থিত হবে যাদের ইচ্ছা হবে না। কিন্তু মসজিদে জুমআর খুৎবাই অনুষ্ঠিত হবে না এমনটা যেন না হয়।

প্রশ্ন (৪৯) : করোনা ভাইরাসের কারণে ঈদের ছালাত মাঠে আদায় না করা গেলে করণীয় কী?

-মামুনুর রশীদ
সাভার, ঢাকা।

উত্তর : 'কোনো সমস্যাকে লক্ষ্য করে ঈদের ছালাত জামাআতবদ্ধভাবে খোলা মাঠে আদায় করা যাবে না'-মর্মে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম ও তাবে-তাবেঈ থেকে কোনো প্রমাণ নেই। অতএব, করোনাকে হিসাব করে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতকে পরিত্যাগ করা যাবে না। বরং তা জামাআতবদ্ধভাবে মাঠেই আদায় করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে নববীর মতো স্থানকে ত্যাগ করে প্রায় ৫০০ গজ দূরে গিয়ে খোলা ময়দানে ঈদের ছালাত আদায় করতেন (যাদুল মাআদ, ১/৪২৫; ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬, 'মিম্বার না নিয়ে ঈদের মাঠে গমন' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬)। তবে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে মাঠে আদায় করা না গেলে নিজ বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঈদের ছালাতের মতোই ১২ তাকবীরসহ ঈদের দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে (ছহীহ বুখারী, 'যার ঈদের ছালাত ছুটে গেছে এবং যারা বাড়িতে ও গ্রামে আছে তাদের ঈদের ছালাত' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (৫০) : ঈদের ছালাত শেষে পিতা-মাতার কবরের পাশে গিয়ে হাত তুলে দু'আ করা যাবে কি?

-ফরিদুল ইসলাম
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : পুরুষ ব্যক্তি কোনো দিন-ক্ষণ নির্ধারণ না করে যে কোনো দিনে কবর যিয়ারত করতে পারে এবং কবরস্থানে গিয়ে একাকী হাত তুলেও দু'আ করতে পারে। কেননা আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, '...তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭৬; আবূ দাঊদ, হা/৩২৩৪; মুসনাদে আহমাদ, ৯৬৮৬)। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাক্বীউল গারক্বাদ (গোরস্থানে) অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে দু'আ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭৪; নাসাঈ, হা/২০৩৬-৩৭)। তবে, কবর যিয়ারতের জন্য কোনো দিনকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং দলবদ্ধভাবে দু'আ করা বিদআত হবে। যেমন : ঈদের দিন, জুমআর দিন ইত্যাদি। কেননা যে সকল স্থানে দলবদ্ধভাবে দু'আ করার প্রমাণ মিলে কবরস্থান তার অন্তর্ভুক্ত নয়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার ব্যাপারে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮; মিশকাত, হা/১৪০)।

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন:

আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর)

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Jamiah As Salafiya General Fund

Account No: 20501130204367701

Account Name: Al Jamiah As Salafiya Zakat Fund

Account No: 20501130204367417

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রম

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ- ঢাকা, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গাইবান্ধা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund

Account No: 20501130204367316

দাওয়াহ কার্যক্রম

মাসিক আল-ইতিছাম, আল-ইতিছাম টিভি, আল-ইতিছাম গবেষণাগার, আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, দাঈ নিয়োগ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Itisam Dawah Fund

Account No: 20501130204367802

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রম

দুস্থ, ইয়াতীম শিক্ষার্থী প্রতিপালন।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Yatim Kollan Fund

Account No: 20501130204367600

ত্রাণ কার্যক্রম

দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলে ত্রাণ সহায়তা ও শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Tran Tahbil Fund

Account No: 20501130204367903

বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ | সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

Monthly Al-Itisam الاعتصام 5th Year, 6th Part, April 2021, Price : 25.00

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী : ১৪৪২, ঈসায়ী : ২০২১, বঙ্গীয় : ১৪২৮

তারিখ হিজরী	তারিখ ঈসায়ী	তারিখ বঙ্গীয়	বার	সাহারীর শেষ সময় ঘণ্টা-মিনিট	ইফতারের সময় ঘণ্টা- মিনিট
০১ রামাযান	১৪ এপ্রিল	০১ বৈশাখ	বুধবার	০৪:২০	০৬:২০
০২ রামাযান	১৫ এপ্রিল	০২ বৈশাখ	বৃহস্পতিবার	০৪:১৯	০৬:২০
০৩ রামাযান	১৬ এপ্রিল	০৩ বৈশাখ	শুক্রবার	০৪:১৮	০৬:২১
০৪ রামাযান	১৭ এপ্রিল	০৪ বৈশাখ	শনিবার	০৪:১৭	০৬:২১
০৫ রামাযান	১৮ এপ্রিল	০৫ বৈশাখ	রবিবার	০৪:১৬	০৬:২২
০৬ রামাযান	১৯ এপ্রিল	০৬ বৈশাখ	সোমবার	০৪:১৫	০৬:২২
০৭ রামাযান	২০ এপ্রিল	০৭ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৪:১৪	০৬:২৩
০৮ রামাযান	২১ এপ্রিল	০৮ বৈশাখ	বুধবার	০৪:১৩	০৬:২৩
০৯ রামাযান	২২ এপ্রিল	০৯ বৈশাখ	বৃহস্পতিবার	০৪:১২	০৬:২৩
১০ রামাযান	২৩ এপ্রিল	১০ বৈশাখ	শুক্রবার	০৪:১১	০৬:২৪
১১ রামাযান	২৪ এপ্রিল	১১ বৈশাখ	শনিবার	০৪:১০	০৬:২৪
১২ রামাযান	২৫ এপ্রিল	১২ বৈশাখ	রবিবার	০৪:০৯	০৬:২৫
১৩ রামাযান	২৬ এপ্রিল	১৩ বৈশাখ	সোমবার	০৪:০৮	০৬:২৫
১৪ রামাযান	২৭ এপ্রিল	১৪ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৪:০৭	০৬:২৬
১৫ রামাযান	২৮ এপ্রিল	১৫ বৈশাখ	বুধবার	০৪:০৬	০৬:২৬
১৬ রামাযান	২৯ এপ্রিল	১৬ বৈশাখ	বৃহস্পতিবার	০৪:০৫	০৬:২৭
১৭ রামাযান	৩০ এপ্রিল	১৭ বৈশাখ	শুক্রবার	০৪:০৪	০৬:২৭
১৮ রামাযান	০১ মে	১৮ বৈশাখ	শনিবার	০৪:০৩	০৬:২৮
১৯ রামাযান	০২ মে	১৯ বৈশাখ	রবিবার	০৪:০২	০৬:২৮
২০ রামাযান	০৩ মে	২০ বৈশাখ	সোমবার	০৪:০১	০৬:২৮
২১ রামাযান	০৪ মে	২১ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৪:০১	০৬:২৯
২২ রামাযান	০৫ মে	২২ বৈশাখ	বুধবার	০৪:০০	০৬:২৯
২৩ রামাযান	০৬ মে	২৩ বৈশাখ	বৃহস্পতিবার	০৩:৫৯	০৬:৩০
২৪ রামাযান	০৭ মে	২৪ বৈশাখ	শুক্রবার	০৩:৫৮	০৬:৩০
২৫ রামাযান	০৮ মে	২৫ বৈশাখ	শনিবার	০৩:৫৭	০৬:৩১
২৬ রামাযান	০৯ মে	২৬ বৈশাখ	রবিবার	০৩:৫৭	০৬:৩২
২৭ রামাযান	১০ মে	২৭ বৈশাখ	সোমবার	০৩:৫৬	০৬:৩২
২৮ রামাযান	১১ মে	২৮ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৩:৫৫	০৬:৩২
২৯ রামাযান	১২ মে	২৯ বৈশাখ	বুধবার	০৩:৫৪	০৬:৩৩
৩০ রামাযান	১৩ মে	৩০ বৈশাখ	বৃহস্পতিবার	০৩:৫৪	০৬:৩৩

বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য জেলাসমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণে অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচি দেখানো হয়েছে। জেলাভিত্তিক সময়সূচি [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
নরসিংদী	-১	-১	-১	-১
গাজীপুর	০	০	০	০
শরিয়তপুর	+১	-১	-১	-১
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	-১	-১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	-৩	-১	-১	-১
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	-১	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৪	+৪
মাদারীপুর	+২	০	০	০
গোপালগঞ্জ	+৪	+২	+১	+১
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২

চট্টগাম বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
কুমিল্লা	-২	-৪	-৪	-৪
ফেনী	-২	-৫	-৫	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৫	-৯	-৯	-৯
নোয়াখালী	-১	-৪	-৪	-৪
চাঁদপুর	০	-২	-২	-২
লক্ষ্মীপুর	০	-৩	-৩	-৩
চট্টগ্রাম	-৩	-৭	-৮	-৮
কক্সবাজার	-২	-৯	-৯	-১০
খাগড়াছড়ি	-৫	-৭	-৮	-৮
বান্দরবান	-৪	-৯	-৯	-১০

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
যশোর	+৬	+৪	+৪	+৪
সাতক্ষীরা	+৮	+৪	+৪	+৪
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৩	+৩	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৫	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৫	+৩	+২	+২
বাগেরহাট	+৫	+১	+১	+১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
পঞ্চগড়	+২	+১০	+১১	+১২
দিনাজপুর	+৩	+৯	+১০	+১০
লালমনিরহাট	-১	+৭	+৭	+৭
নীলফামারী	+২	+৯	+৯	+১০
গাইবান্ধা	০	+৫	+৫	+৬
ঠাকুরগাঁও	+৩	+১০	+১১	+১২
রংপুর	০	+৭	+৭	+৮
কুড়িগ্রাম	-১	+৬	+৬	+৬

সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতে হবে বিলম্বে নয়: সাহল (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে; ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।

(ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৮)।

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
সিলেট	-৮	-৫	-৫	-৪
মৌলভীবাজার	-৭	-৫	-৫	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৩	-৩	-৩
সুনামগঞ্জ	-৭	-২	-২	-২

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
শেরপুর	-১	+৩	+৩	+৪
ময়মনসিংহ	-২	+১	+১	+২
জামালপুর	-১	+৩	+৪	+৪
নেত্রকোণা	-৪	০	০	+১

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৪	+৪
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+২	+৫	+৬	+৬
রাজশাহী	+৬	+৮	+৮	+৮
নাটোর	+৪	+৬	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৭	+৭	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৯	+১০	+১০
নওগাঁ	+৪	+৭	+৭	+৮

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	ইফতার ১১-২০	ইফতার ২১-৩০
ঝালকাঠি	+৩	০	-১	-১
পটুয়াখালী	+৩	-১	-২	-২
পিরোজপুর	+৪	+১	০	০
বরিশাল	+২	-১	-১	-২
ভোলা	+১	-২	-৩	-৩
বরগুনা	+৪	-১	-১	-২

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া (www.bmd.gov.bd)
মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com)
গণনা পদ্ধতি: University of Islamic Sciences,Karachi.